দাম : সাত টাকা

স্বস্তিকা

বাইশে শ্রাবণ স্মরণে

৬৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা।। ১৩ আগস্ট - ২০১২।। ২৮ শ্রাবণ - ১৪১৯

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৮

তৃণমূলী রেলমন্ত্রীর দৌলতে ট্রেন-যাত্রা পরলোক-যাত্রা হয়ে দাঁড়িয়েছে □ ৯

শাসক দলের হুমকিতে নতজানু হয়ে ৩১-এর ধর্মঘট প্রত্যাহার সি পি এমের □ ১০

টাকার অবমূল্যায়ন : অর্থনীতির অশনিসংকেত □ অম্লানকুসুম ঘোষ □ ১১

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-চেতনা ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা □ সুতপা চক্রবর্তী □ ১৩

লৌকিক দেবতা ক্ষেত্রপাল □ নবকুমার ভট্টাচার্য □ ২১

কৃষ্ণ চরিত্র □ প্রীতিমাধব রায় □ ২২

খোলা চিঠি : দাদাগিরি প্রয়াত হয়েছেন, এক মিনিট নীরবতা পালন করুন □ সুন্দর মৌলিক □ ২৭

পশ্চিম এখন গভীর সঙ্কটে □ জয় দুবাসী □ ২৮

সর্বনাশের পদধ্বনি □ নটরাজ ভারতী □ ৩০

পায়ে পায়ে পঁয়ষট্টি □ রোহিনী প্রসাদ প্রামাণিক □ ৩২

সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত মুক্তধারা □ বিকাশ ভট্টাচার্য □ ৩৬

উর্দু দৈনিকে মোদীর বিস্ফোরক সাক্ষাৎকার : 'আমি দোষী হলে আমায় ফাঁসি দাও' □ ৩৭

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ □ ভাবনা-চিন্তা : ২০ □ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ □ অঙ্গনা : ২৬ □
অন্যরকম : ৩৫□ □ □ শব্দরূপ : ৪০ □ □ চিত্রকথা : ৪১ □ □ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

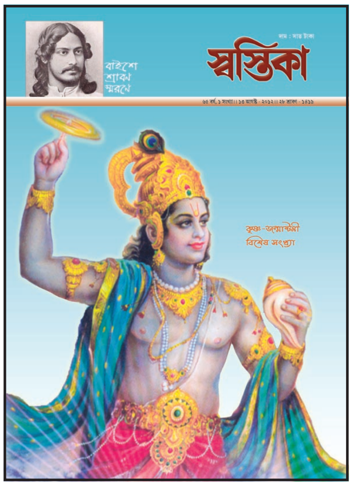

কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী বিশেষ সংখ্যা

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৫ বর্ষ ১ সংখ্যা, ২৮ শ্রাবণ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১৪, ১৩ আগষ্ট - ২০১২

দাম : ৭ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

৬৫ বছরে স্বস্তিকা'র শুভেচ্ছা

শুভ জন্মাষ্টমী তিথিতে স্বস্তিকা ৬৫তম বর্ষে পদার্পণ করল। এই উপলক্ষে স্বস্তিকা-র সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক, এজেন্ট, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা এবং শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

— স্বস্তিকা পরিবার

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা-র বিশেষ বার্ষিক গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান

স্বস্তিকা একটি প্রকৃত জাতীয়তাবাদী নির্ভীক সংবাদ সাপ্তাহিক। আগামী ৯ আগষ্ট, ২০১২, শুভ জন্মাষ্টমী তিথিতে স্বস্তিকা ৬৫ বছরে পদার্পণ করছে। এই উপলক্ষে এবং স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশত জন্মবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি রূপে স্বস্তিকা-র বিশেষ নতুন বার্ষিক গ্রাহক সংগ্রহ অভিযানের এক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। অভিযানের সময়কাল ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১২।

সকল পাঠক-বন্ধুদের প্রতি বিনম্র নিবেদন এই যে, আপনি নিজে এই পত্রিকার গ্রাহক হোন ও অন্যদের গ্রাহক হতে অনুপ্রাণিত করুন। স্বস্তিকা-র বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা মাত্র। অভিযান চলাকালীন এবং সর্বশেষ ৭ই অক্টোবর, ২০১২-র মধ্যে গ্রাহকের সম্পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহকমূল্য স্বস্তিকা দপ্তরে জমা করে রসিদ সংগ্রহ করুন। এর ফলে এবছরের স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা পেতে সুবিধা হবে। চেক বা ড্রাফট্ **Swastika** -এই নামে লিখে স্বস্তিকার ঠিকানায় পাঠাবেন। এছাড়া স্বস্তিকা-র নামে মানিঅর্ডার যোগেও টাকা পাঠাতে পারেন। ঠিকানা— ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০৬।

আপনাদের সকলের সহযোগিতার জন্য অত্যন্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই পত্রিকা ৬৫ বছর অতিক্রম করেছে। ভবিষ্যতের জন্যও আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য।

—স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

১৫ আগষ্ট বিশেষ সংখ্যা

১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট ‘স্বাধীনতা’ পেলেও ইপ্সিত ‘স্বাধীনতা’ মেলেনি। ১৫ আগষ্ট মুক্তির আনন্দের পাশাপাশি দেশভাগের বেদনা আজও আমাদের বেদনাহত করে। অতি সম্প্রতি কোকরাঝাড়ের ঘটনা সহ ইদানীংকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমান তোষণকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকে যেভাবে মদত দেওয়া হচ্ছে, তাতে অচিরেই পরিস্থিতি আবার ’৪৭-এর দিকে মোড় নেবে বলে আমাদের আশঙ্কা। পাঠকদের আরও একবার সতর্কবার্তা দিচ্ছেন **বাসুদেব পাল**। স্বাধীনতা সংগ্রামের দুই ধারা সম্পর্কে লিখছেন **নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত**। সেইসঙ্গে ঋষি অরবিন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে থাকছে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি। অন্যান্য আকর্ষণীয় বিষয় তো থাকছেই।

।। দাম একই থাকছে — সাত টাকা।।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্

ভারত যে সন্ত্রাসবাদীদের প্রধান নিশানা সম্প্রতি পুনাতে ধারাবাহিক বিস্ফোরণে তাহা আরও একবার প্রমাণ হইয়া গেল। ২০০২-এ মুম্বাই-তে বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে যাহার সূচনা, তাহা এখনও অব্যাহত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৯।১১-র পর সন্ত্রাসবাদীরা আর সেখানে কোনও বড় ধরনের হামলা করিতে পারে নাই। কিন্তু এই দেশে গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ পীঠস্থান সংসদ ভবন আক্রমণের পরও সন্ত্রাসবাদীদের প্রতিহত করা সম্ভব হয় নাই। পুণায় বোমা বিস্ফোরণের কারণ হিসাবে সরকার যাহাই বলুক না কেন, কিংবা যাহাকেই দোষী সাব্যস্ত করুক না কেন, গুপ্তচর বিভাগের ব্যর্থতা যে ইহার অন্যতম প্রধান কারণ, ইহার দায়ভার কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার এড়াইয়া যাইতে পারে না। সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলা করিবার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জাতীয় সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ কেন্দ্র (NCTC) গঠনের প্রস্তাব দিয়াছিল, কিন্তু কার্যত কাগজপত্রে ব্যতীত ইহার কোনও অস্তিত্ব নাই। এই দেশের সব প্রকারের গুপ্তচর এজেন্সী, রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং (র), এভিয়েশন রিসার্চ সেন্টার (এ আর সি), ইন্টিলিজেন্স ব্যুরো (আই বি), ন্যাশনাল টেকনিক্যাল রিসার্চ অর্গানাইজেশন (এন টি আর ও), ডিফেন্স ইন্টিলিজেন্স এজেন্সী (ডি আই এ) ইত্যাদি সংস্থা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করিতেছে। এই সকল বিভিন্ন এজেন্সীগুলির মধ্যে যে কোনও রকম সমন্বয় ও সহযোগিতা নাই, সংকটের সময় তাহা আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাইয়া থাকি। আমাদের গুপ্তচর বিভাগ ও তদন্তকারী সংস্থাগুলি কোনও সন্ত্রাসবাদী হামলার বিশ্লেষণের পর আক্রমণকারীরা কিভাবে পরিকল্পনা করিয়াছিল ইহাই শুধু বলিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত দোষী কাহারা তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করিতে প্রায়ই ব্যর্থ হয়। তাহাদের নিকট হইতে এইটুকুই মাত্র সতর্কবার্তা পাওয়া যায়— রাজধানী দিল্লী বা দেশের কোনও মহানগরে হামলা হইতে পারে। পুণার বোমা বিস্ফোরণের তদন্তের ক্ষেত্রেও ইহা ঘটিয়াছে। স্বস্তির খবর একটাই, পুণায় বিস্ফোরণের জন্য ব্যবহৃত বোমা বিশেষ শক্তিশালী ছিল না।

এই বিষয়ে কোনও দ্বিমত নাই যে গুপ্তচর বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় খবরাখবর সংগ্রহ অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে— সন্ত্রাসবাদী হামলার মোকাবিলার জন্য আমাদের নিরাপত্তা কর্মীরা কি যথেষ্ট প্রশিক্ষিত নয়? তাহাদের কাছে কি যথেষ্ট সাজ-সরঞ্জাম নাই? কিংবা পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুসারে আমাদের আইনের পরিবর্তন করা হইয়াছে কি? কেননা ২০০৯-এর অক্টোবরে স্বয়ং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বীকার করিয়াছিলেন যে সাধারণ পুলিশ কনস্টেবল আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন একক এবং ইহারাই সব থেকে প্রতারিত শ্রেণী। সর্বাধিক নিন্দিত সরকারী কর্মচারী। অথচ অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার ক্ষেত্রে ইহারাই সবার আগে পৌঁছায়। পুলিশ অফিসার ও পুলিশ কনস্টেবলের জন্য প্রায় তিন লাখ পদ শূন্য। পুরানো অস্ত্রশস্ত্র ও যথেষ্ট প্রশিক্ষণের অভাবে পুলিশ বিভাগ ভুগিতেছে।

প্রচলিত একটি ধারণা হইল, বিশেষত রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে দেশের মুসলিম সমাজ ক্ষুব্ধ হইবে। আমাদের দেশে আতঙ্কবাদে প্রসারের অন্যতম বড় আরও একটি কারণ—ইহার মোকাবিলার জন্য কোনও কঠোর আইন নাই। রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার প্রয়োজনে যদি পুরাতন আইন বাতিল করা যায়, তাহা হইলে মাথার উপর কোনও পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িবে না। সরকারকে ভাবিতে হইবে যে সন্ত্রাসবাদীদের কোনও মানবাধিকার নেই। কেননা তাহারা শত শত নিরীহ মানুষকে হত্যা করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে নাই। যে সন্ত্রাসবাদী শত শত নিরীহ মানুষ হত্যার জন্য দায়ী, তাহাকে ফাঁসিতে ঝুলাইলে মানবাধিকার ক্ষুণ্ণ হইবে—এই ভাবনা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। উপরন্তু, আমাদের দেশে ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি এবং বিশেষ কোনও এলাকায় উত্তেজনার আশঙ্কা— সন্ত্রাসবাদী মোকাবিলার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই পুণার পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধের জন্য চাই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা ও তাহা কার্যকর করিবার জন্য প্রশাসনিক দৃঢ়তা। দুষ্কৃতীদের বিনাশের জন্য এই কঠিন-কঠোর পদক্ষেপেই হইবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্' বাণীর প্রকৃত অনুশীলন।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

প্রাচীন ভারতবর্ষের সর্বযুগেই মননশীলতা ও আধ্যাত্মিকতা জাতির প্রাণকেন্দ্র ছিল, রাজনীতি নয়। বস্তুতঃ আধুনিক কালের মতো প্রাচীনকালেও রাজনীতিক ও সামাজিক ক্ষমতা—অধ্যাত্মিক সাধনা ও বিদ্যাবুদ্ধি-চর্চার নিম্নে স্থান পাইত। মুনি-ঋষি এবং আচার্যগণ যে-সকল শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করিতেন, সেগুলিকে অবলম্বন করিয়াই জাতীয় জীবন উচ্ছ্বসিত হইত।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

বড়োল্যাণ্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের দাবী

সশস্ত্র বাংলাদেশীরা জলপথে ধুবড়ি হয়ে কোকরাঝাড়ে ঢুকেছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কোকরাঝাড়ের জাতিদাঙ্গায় ব্যাপক জীবনহানি ঘটলেও অসম সরকার কোনওরকম বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের জড়িত থাকার কথা একেবারেই খারিজ করেছে। অথচ, প্রায় প্রতিটি অকংগ্রেসী দল এবং ভুক্তভোগী বড়োরা বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদেরই এই ভয়াবহ জাতিদাঙ্গার জন্য দায়ী করছে। অসমের লাগোয়া ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে দুর্বল প্রতিরক্ষাব্যবস্থা, খোলামেলা সীমান্ত কোনওমতেই অসমে বাংলাদেশ থেকে ব্যাপকহারে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে পারেনি— এটাই বাস্তব সত্য। ইতিমধ্যে কোকরাঝাড়ের দাঙ্গায় ৬০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটেছে, চার লক্ষাধিক নিরীহ সাধারণ মানুষ হয়েছে গৃহহারা। তাদের ঠাঁই হয়েছে ত্রাণশিবিরে।

বাংলাদেশীদের দাঙ্গায় যুক্ত থাকার সর্বপ্রথম অভিযোগ এনেছিলেন বড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হাগ্রামা মাহিলারি। তিনি একথাও বলেছিলেন যে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে বাংলাদেশীরা জলপথে ধুবড়ি হয়ে কোকরাঝাড়ে ঢুকেছিল। কেন্দ্র সরকারের পক্ষে দাঙ্গায় বাংলাদেশীরা যুক্ত ছিল না বলে যে দাবী করা হচ্ছে, শ্রীমাহিলারি তারও বিরোধিতা করেছেন। বরং তিনি আরও একবার জোরালোভাবে অসমে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ-এর বিষয়টা জনসমক্ষে তুলে এই ভয়াবহ বিপদ থেকে সকলকে সাবধান করে দিতে সচেষ্ট হয়েছেন বলা যায়। যে বিপদের বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বরাবর অবহেলাই করে এসেছে। মহিলারি ঠিক বলছেন না ভুল বলছেন তা সোজা অস্বীকার না করে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সরজমিন তদন্ত করে দেখা উচিত।

হাগ্রামা মাহিলারি

বিভিন্ন মহল থেকে অসমে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া এবং বিতাড়িত করাতে রাজ্য সরকার রীতিমতো অবজ্ঞা করেছে বলে অভিযোগ করা হচ্ছে। এমনকী দিসপুর কোনওরকম কার্যকর ব্যবস্থাই নেয়নি বলে অভিযোগ। সবথেকে মারাত্মক অভিযোগ হলো, অসমের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বা 'সেকেন্ড লাইন অফ্ ডিফেন্স'-কে কোনওরকম শক্তিশালী করা হয়নি। প্রথম প্রতিরক্ষা লাইন যদি বি এস এফ হয় তাহলে দ্বিতীয় সুরক্ষা ব্যূহ অবশ্যই অসম পুলিশ। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে প্রহরারত অর্ধেকের বেশি জওয়ানদের হাতে কোনওরকম বন্দুক দেওয়া হয়নি। ১২৬ জন পুলিশ সীমান্ত পাহারা দেয়, তারমধ্যে ৬৮ জনের হাতে কোনওরকম অস্ত্রই নেই। ৫৮ জন সশস্ত্র বাহিনীর জওয়ান।

সরকারি রেকর্ড অনুসারে ১৯৮৬ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে আই এম ডি টি আইনে মাত্র ৩৯,২৮৭ জন বিদেশীকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তবে তারা সবাই বর্তমানে ফেরার। সরকারের কাছে এদের বিষয়ে কোনও খবর নেই। ওই ফেরারী ফৌজ বর্তমানে অসামাজিক ভারত- বিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত বলে অনেকের অভিযোগ। অসম-বাংলাদেশ সীমান্তের ২৬৩ কিমি সীমান্তে বেড়াবিহীন ফাঁকা এলাকা দিয়ে ব্যাপকহারে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ হচ্ছে। সূত্রমতে অসমের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় লাইন মজবুত না হলে কোকরাঝাড়ের মতো জাতিদাঙ্গায় বাংলাদেশীদের জড়িত থাকার অভিযোগ উঠবেই।

রোজা উপলক্ষে মালদায় প্রকাশ্যেই গো-হত্যা হচ্ছে

তরুণ কুমার পণ্ডিত : মালদা ॥ রমজান মাস শুরু হতেই মালদা জেলা জুড়ে প্রতি শুক্রবার এবং অন্যান্য বারেও প্রকাশ্যে রাস্তার ধারে গো-হত্যা করা হচ্ছে। মালদা জেলার ইংলিশবাজার থানার সুজাপুর কমলাবাড়ী, ভাবটোলা, হরিশচন্দ্রপুর, চাঁচল ও কালিয়াচকের বিভিন্ন গ্রামে মুসলিমরা রোজার শেষে গো-মাংস দিয়ে রোজা ভঙ্গ করছে এবং হিন্দুদের কথা চিন্তা না করেই দিনেরবেলাতে প্রকাশ্য রাস্তার ধারে গো-হত্যা চলছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে এই রোজার সময় রমজান মাসে মালদা জেলাতে প্রতি শুক্রবার কমপক্ষে এক থেকে দেড় হাজার গোরু কাটা হয়। ঈদের দিনে সেই সংখ্যা ১০ হাজার ছাড়িয়ে যাবে বলে আশঙ্কা। সরকার পরিবর্তনের আগে মালদা জেলাতে এইভাবে ব্যাপক এবং প্রকাশ্যে গো-হত্যা করা হোত না। পথচলতি হিন্দুরা তাদের শ্রদ্ধার বস্তুকে এইভাবে হত্যা হতে দেখে দুঃখ পায়, কিন্তু কিছু করতে পারে না। অনেক শিক্ষিত মানুষ শিক্ষক ও ছাত্রদের মুখে শোনা যাচ্ছে মা-মাটি- মানুষের সরকার এসে সংখ্যালঘুদের সাহস বাড়িয়ে দিয়েছে। উচ্চ আদালতের রায়কে অবমাননা করে প্রকাশ্য স্থানে গোরু হত্যা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মালদা জেলার ইংলিশ বাজার থানার সদুল্লাপুর মহাশ্মশানের কাছে একটি পীরের মেলা উপলক্ষে হাজার হাজার মুসলিমরা জমায়েত হয় এবং তিন দিনে কয়েকশো গো-হত্যা করা হয়। হিন্দুরা এর বিরুদ্ধে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করলেও কোনও ফল হয়নি।

সংবাদ প্রতিবেদন

রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা রুজু করেছিল সমাজবাদী পার্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত মার্চ মাসে উত্তরপ্রদেশের পালাবদলের পর বিভিন্ন বিস্ফোরক খবরাখবরকে ধামাচাপা দেওয়ার জোর রাজনৈতিক প্রচেষ্টা চলেছে। এমনি একটি চাঞ্চল্যকর মামলার খবর সম্প্রতি ফাঁস হয়েছে। ছোটখাটো নয়, জনস্বার্থ মামলাটি হাইকোর্ট হয়ে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট অবধি গড়িয়েছে। সংবাদসূত্রে প্রকাশ, জনৈক কিশোর সামরাইট নামে সমাজবাদী পার্টির এক প্রাক্তন বিধায়ক ২০১০ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চে কংগ্রেসী 'যুবরাজ' ও সাধারণ সম্পাদক রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে আমেঠি বিধানসভা এলাকার এক জনজাতি রমণীকে অপহরণ ও ধর্ষণের নির্দিষ্ট অভিযোগে একটি রিট পিটিশন (জনস্বার্থ মামলার আদলে) দায়ের করেন।

আদালতের সূত্র অনুযায়ী, ২০১১ সালের ৭ মার্চ হাইকোর্ট মামলাটি শুধু খারিজই করে দেয়নি, সেইসঙ্গে মামলাকারীর ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানাও করেছে। এছাড়া সিবিআই-কে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে তদন্ত করার আদেশ দেওয়া হয়। কিশোর সামরাইট সুপ্রিম কোর্টে ওই রায়ের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানান। মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট এলাহাবাদ হাইকোর্টের এই রায়ের ওপর ৬ এপ্রিল ২০১১ সালে স্থগিতাদেশ দেয়।

গত সপ্তাহে রাহুল গান্ধী মহামান্য সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছে, তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি মিথ্যা, কুৎসাপ্রণোদিত ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আবেদনকারী সামরাইটের বয়ান অনুযায়ী উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদী পার্টির মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব কোর্টকে দেওয়া হলফনামায় সম্প্রতি জানিয়েছেন আবেদনকারী (সামরাইট) একজন মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি। এ প্রসঙ্গে ক্ষুব্ধ সামরাইট বলেন, এই দলের সর্বোচ্চ নেতারাই তাঁকে সেই সময় লোকসভা চলাকালীন দিল্লীতে ডেকে পাঠান। মামলার গুরুত্ব সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তৃতা করেন এবং তাঁকে এই মামলাটি দায়ের করতে সবরকমভাবে প্ররোচিত করেন। অতীতে বিভিন্ন জনস্বার্থ মামলা সফলভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতার সুবাদেই তাঁরা যে তাঁকে নির্বাচন করেছেন তিনি সে কথাও স্মরণ করিয়ে দেন। সমাজবাদী দলের নেতৃবৃন্দ সেইসময় আমেঠির গ্রামীণ অঞ্চলে ঘটে যাওয়া এমন একটি সত্য ও ভয়ঙ্কর ঘটনা (তাঁদের মত অনুযায়ী)-র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনিও একজন দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে মামলাটি দায়ের করেছিলেন। ঘটনাটির সত্যানুসন্ধানে তদন্ত করানোই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। রাহুল গান্ধী বা কোনও ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বিদ্বেষ বিবেচ্য ছিল না। সমাজবাদী পার্টির টিকিটে মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার লালজী কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত এই প্রাক্তন বিধায়কের বয়ান অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে ৭ মার্চ ২০১১'র হাইকোর্ট নির্দেশ বলে সিবিআই তাকে জেরা করলে তিনি মামলা দায়ের করার পূর্বাপর ঘটনা তাঁদের কাছে সবিস্তারে জানিয়েছেন। তখন হলফনামা দিয়ে উত্তরপ্রদেশ সরকারের তাঁকে মানসিক ভারসাম্যহীন বলে প্রতিপন্ন করার অপকৌশল যে রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণ পাল্টে যাওয়া ও কংগ্রেস দলের সঙ্গে সমাজবাদী পার্টির গোপন বোঝাপড়ারই ফলশ্রুতি সে কথাও তিনি সুপ্রিম কোর্টকে অকপটে জানাতে ভোলেননি।

বার্ষিক গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে বিশেষ আবেদন

ডাকযোগে যাঁরা স্বস্তিকা নেন, তাঁরা প্রতি কপির উপরে কাগজে লেখা গ্রাহক নম্বর এবং মেয়াদ শেষের তারিখ দেখে সেই অনুসারে মেয়াদ শেষের এক মাসের মধ্যে মনিঅর্ডার কিংবা অন্য উপায়ে পরবর্তী বছরের নবীকরণের জন্য গ্রাহক মূল্য পাঠিয়ে রসিদ সংগ্রহ করবেন। পুরনো গ্রাহকরা অবশ্যই গ্রাহক নম্বর লিখে পাঠাবেন। যদি কোনও কারণে নবীকরণ করা সম্ভব না হয় তাও সত্বর স্বস্তিকা কার্যালয়ে জানাবেন। নতুনদের ক্ষেত্রে পুরো নাম-ঠিকানা (পিন সহ) ও টাকা পাঠিয়ে রসিদ নেবেন।

□□ □□ □

যাঁরা এজেন্টদের মাধ্যমে স্বস্তিকা পেয়ে থাকেন, তাঁরা তাঁদের বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদের তারিখ এজেন্টের কাছে জেনে নিয়ে এক মাসের মধ্যে এজেন্টের মাধ্যমে নবীকরণের টাকা জমা করে তার মাধ্যমেই রসিদ সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে নবীকরণ সম্ভব না হলে এজেন্টদের মাধ্যমে কার্যালয়ে জানাবেন। পুনরায় যখন গ্রাহক মূল্য জমা দেবেন সেই সময় থেকে পত্রিকা আবার চালু করা হবে। এজেন্টের সঙ্গে সবদিক থেকে সহযোগিতা ও যোগাযোগ রাখতে পারলে ভালো। সর্বত্রই গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন। আপনার নিকটবর্তী এজেন্টের সঙ্গে সম্পর্কের জন্য তার ফোন নম্বর সংগ্রহ করে রাখা ভালো। উল্লেখ্য, স্বস্তিকা থেকে এজেন্টকে গ্রাহকদের তালিকা পাঠানো হয়ে থাকে।

—ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

সংবাদ প্রতিবেদন

ইফতার পার্টিতেই সরকারি খরচ প্রায় দু’ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিদেশ মন্ত্রক, লোকসভা ও রাজ্যসভার সচিবালয় এবং সি পি ডব্লিউ ডি মিলে প্রায় দু’ কোটি টাকা ১৮টি ইফতার পার্টিতে খরচ করেছে। যদিও জনগণের টাকা (Public Funds) এভাবে খরচ করা যায় না বলে অর্থ মন্ত্রকের নির্দেশ রয়েছে। ইংরেজী দৈনিক ‘ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’ তথ্য জানার অধিকার আইনে পিটিশন করাতে ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে। গত এক দশক ধরে এই একই কুকীর্তি চলেছে বলে পত্রিকাটি জানিয়েছে। অথচ অর্থ মন্ত্রক বলেছে, সরকারি অর্থ এভাবে ইফতার পার্টিতে খরচ করা যায় না। শুধু তাই নয়, ওইসব দপ্তরগুলি খরচের ব্যাপারে কোনওরকম স্বচ্ছতার ধার ধারেনি। আগাম অনুমতিও নেয়নি।

২০০৭-’০৮-এ রাজ্যসভা সচিবালয়ই ২২.৭৫ লক্ষ টাকা খরচ করেছে পাঁচটি ইফতার পার্টিতে। সচিবালয় জোরের সঙ্গে দাবী করেছে— এখানে আইন নেই, প্রথা আছে। তাদের আরও বক্তব্য, রাজ্যসভা সচিবালয় এবং বিদেশমন্ত্রক ২ : ১ অনুপাতে খরচ করেছে। ২০১০-১১-তে লোকসভা সচিবালয় দুটি ইফতারে জনগণের অর্থ নয়ছয় করেছে বা ভুরিভোজে খরচ করেছে ৫.৮৩ লক্ষ টাকা। তাদের বক্তব্য— ‘ইফতারে খাওয়া-দাওয়া মানে লোকসভার আতিথেয়তা’। ২০০৪-এ প্রথম ইউ পি এ সরকারের আমলে ছয়-ছয়টি ইফতার পার্টিতে খরচ করেছে ১.০৩ কোটি টাকা। এখানে বিদেশমন্ত্রক এবং সি পি ডব্লিউ ডি ও ওই অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিল। বিদেশমন্ত্রক দশটি ইফতার পার্টির আয়োজন করে ৪১.৪৮ লক্ষ টাকা খরচ করেছে বলে জানানো হয়েছে। একটি ইফতার পার্টি আয়োজন করেছিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ২০০৪ সালে। সব দপ্তর মিলিয়ে খরচের পরিমাণ ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। এই প্রসঙ্গে আরও বিস্তারিত তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছিল ওই আবেদনে (রাইট টু ইনফর্মেশন)। কিন্তু জবাব দেওয়া হয়েছে— আর বিশেষ কোনও তথ্য নেই।

সরকারি অর্থ কি খরচ করা যায়— এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন দপ্তরের বক্তব্য হলো—

অর্থমন্ত্রক	—	না।
রাজ্যসভা সচিবালয়	—	কোনও বিশেষ তথ্য নেই।
লোকসভা সচিবালয়	—	হ্যাঁ।
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	—	আমাদের রেকর্ডে এরকম তথ্য মজুত নেই।

যদি খরচ হয়ে থাকে তাহলে তা কোন্ আইন বলে

রাজ্যসভা সচিবালয়	—	আইন নেই। প্রথা অনুসারে খরচ করা হয়।
বিদেশ মন্ত্রক	—	কোনও বিশেষ তথ্য নেই।
লোকসভা সচিবালয়	—	খরচ অতিথি সেবার অনুমোদন থেকে করা হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	—	আমাদের রেকর্ডে কোনও তথ্য নেই।

কোন্ খাতে কত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে

রাজ্যসভা সচিবালয়	—	অন্যান্য প্রশাসনিক খরচ-এ।
বিদেশ মন্ত্রক	—	কোন বিশেষ তথ্য মজুত নেই।
লোকসভা সচিবালয়	—	প্রশাসনিক খরচ (আতিথেয়তা গ্রান্ট)।
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	—	আমাদের এমন কোনও তথ্য নেই।

২০০৪ থেকে এখনও পর্যন্ত কত টাকা খরচ করা হয়েছে

রাজ্যসভা সচিবালয়	—	২২.৭৫ লক্ষ টাকা
লোকসভা সচিবালয়	—	৫.৮৩ লক্ষ টাকা
বিদেশ মন্ত্রক	—	৪৩.১৫ লক্ষ টাকা
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	—	১.০৩ কোটি টাকা

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আমাদের দেশে রমজানের শেষে মুসলমান নাগরিকদের সম্মানে সূর্যাস্তের পর যে ভোজসভা বসে সেটাই ইফতার পার্টি। এই ইফতার পার্টিতে হিন্দুরা যোগ দিলে তারা সবক্ষেত্রেই ফেজটুপি মাথায় চড়িয়ে একত্র বসে খাওয়া দাওয়া করেন। তবে, এই টুপির ব্যাপারটা বাধ্যতামূলক কিনা তা জানা নেই। কেন্দ্র সরকারের ওইসব দপ্তরে রাখীবন্ধন, বিজয়া দশমী, দীপাবলী বা হোলি মিলন উপলক্ষে এরকম খরচ বা অনুষ্ঠান হয়েছে কিনা জানা নেই।

নেই কোনও দেশ, নেই কোনও কোচ, কিন্তু সেও আছে অলিম্পিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গুওর মারিয়াল (Guor Marial) চলতি বিশ্বের সর্বোত্তম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা লণ্ডন অলিম্পিকে অংশ নিচ্ছে। কিন্তু সরকারি ভাবে কোনও দেশ তাকে পাঠায়নি। না আছে তার কোনও প্রশিক্ষক, আর না কোনও স্পনসর। এতসব সে পাবেই বা কোথায়? মারিয়ালের শৈশব কেটেছে দক্ষিণ সুদানের প্রত্যন্ত গ্রামে— রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের আবহে নিজেকে বাঁচাবার ভয়ঙ্কর লড়াইয়ে। হ্যাঁ, একটি প্রশিক্ষণই সে নিতে বাধ্য হয়েছিল, দক্ষিণ সুদানের উষর মরুভূমির মধ্যে জল ও আশ্রয়ের সন্ধানে নিরন্তর দৌড়ে বেড়ানোর তাগিদে। বলতেই হবে অসম যুদ্ধে টিঁকে থাকার লড়াইয়ে সে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিযোগী। দীর্ঘ ২০ বছর ধরে চলা তার দেশের গৃহযুদ্ধে ২০ লক্ষ মানুষ মারা যায়। মারা যায় মারিয়ালের ১০ ভাই-বোনের ৮ জনই। আক্রমণকারী সুদানী সৈন্যরা তার গ্রাম জ্বালিয়ে দিলে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু ঠেকাতে পলাতক মারিয়াল এক সেনা অফিসারের বাড়ীতে দাস হিসেবে থাকতে পায়। এই মারিয়ালই বিশ্বের বৃহত্তম ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় গত ৫ আগস্ট, ’১২ ম্যারাথন দৌড়ে ছুটল। সদ্য গত বছরের জুলাই মাসে স্বাধীনতা প্রাপ্ত পৃথিবীর নবীনতম দেশের (যার কোনও অলিম্পিক কমিটি এখনও হয়নি) তথাকথিত গোত্রহীন প্রতিনিধি আশ্রয় পেল অলিম্পিক পতাকাতলে।

তৃণমূলী রেলমন্ত্রীর দৌলতে ট্রেন-যাত্রা পরলোক-যাত্রা হয়ে দাঁড়িয়েছে

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে যতই দেখছি এবং শুনছি ততই চমৎকৃত হচ্ছি। উপায়ও নেই। রাজ্যের পাঁচ-ছয়টি বাংলা টিভি চ্যানেলে ২৪ ঘণ্টাই ‘দিদি’-র কথামৃত স্বকণ্ঠে প্রতিদিন শোনাচ্ছে, দেখাচ্ছে। আর দিদি-র শাড়ির আঁচল ধরে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী কলুর বলদের মতো সর্বত্র ঘুরছেন তা টিভিতে দেখে সকলেই কম বেশি চমৎকৃত। প্রতি সপ্তাহেই দেশের কোথাও না কোথাও ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটছে। অসংখ্য যাত্রী মারা যাচ্ছেন। রেলযাত্রায় যাত্রী নিরাপত্তা মোটেই সুরক্ষিত নয়। তৃণমূল রেলমন্ত্রীর দৌলতে ট্রেন যাত্রা এখন সশরীরে পরলোক যাত্রায় দাঁড়িয়েছে। তাতে কী হয়েছে। রেলমন্ত্রী দিদির আঁচল ছেড়ে দিল্লীতে রেলভবনে বসে কাজকর্ম করবেন না। এমন আঁচলধরা এক বয়স্ক শিশুকে ভারতের রেল প্রশাসনের শীর্ষে বসিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। যদিও নেপথ্যে কলকাঠি নেড়েছিলেন আমাদের রাজ্যের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। তাঁরই সুপারিশে এমন এক অযোগ্য ব্যক্তিকে রেলের দায়িত্ব দেওয়া হয়। যার ফল ভুগতে হচ্ছে সারা দেশের সাধারণ মানুষকে। ভেবে দেখুন তো, ‘দিদি’ পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় ঘুরে উন্নয়ন করে বেড়াচ্ছেন। ভাল কথা। কিন্তু সেখানে তাঁর সঙ্গে দেশের রেলমন্ত্রী ঘুরছেন কেন? ‘দিদি’-র জেলা সফরে তাঁর পার্মানেন্ট সফর সঙ্গী রেলমন্ত্রী। পদ মর্যাদায় একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অপেক্ষা কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী বড়। তাই কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর এইভাবে মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর শাড়ির আঁচল ধরে ঘোরাটা তাঁর পদের পক্ষে উপযুক্ত নয়। এতে বাংলা এবং বাঙালির সম্মানহানি হচ্ছে। হাসির খোরাক হচ্ছে। রেলমন্ত্রী সবই জানেন। কিন্তু আঁচলধরা রেলমন্ত্রী কলকাতা ছেড়ে দিল্লীতে রেলভবনে বসতে ভরসা পান না। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়া তাঁর প্রতিটি জেলা সফরে প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন। রাজ্যের জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, স্কুল গড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ফুটছে। রাজ্যে তিনি পাঁচটি ‘পুলিশ কমিশনারেট’ গড়ে দিয়েছেন। তাতে রাজ্যবাসীর কী লাভ হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না। হাওড়া, সল্টলেক অথবা দুর্গাপুরে পুলিশ কমিশনারেট করার পর সেখানে ক্রাইম রেট অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। বিশেষত, মেয়েদের শ্লীলতাহানির ঘটনা এতটাই বেড়েছে যে পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন আছে কীনা সে সম্পর্কে সন্দেহ জাগছে। তাই

তামিলনাড়ু এক্সপ্রেসে রহস্যময় আগুন।

কমিশনারেট করে পরিস্থিতির কতটা উন্নতি হয়েছে সে কথা রাজ্যের পাঁচটি কমিশনারেটের বাসিন্দারাই ভাল জানেন। আসলে এইসবই প্রচারের রাজনৈতিক চমক। কথায় আছে, ঠিকমতো প্রচার করলে টক আমড়াকেও মিষ্টি আম বলে বাজারে চালিয়ে দেওয়া যায়। ক্ষমতায় থাকাকালে সিপিএম এই গোয়েবলিয় প্রচার চালাতো। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীও সেই চেনা পথেই হাঁটছেন। একদা স্কুল-কলেজ ছাত্রছাত্রী ভর্তি নিয়ন্ত্রণ করতো সিপিএম অনুগামী সংগঠন এস এফ আই। এখন সেই কাজটি করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। তৃণমূলের আমলে স্কুল-কলেজে যতজন শিক্ষক-অধ্যাপক ছাত্রদের হাতে মার খেয়েছেন তার নজির বামফ্রন্টের জমানায় নেই। এখন আবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের গোষ্ঠি লড়াই শুরু হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতা চলছে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কিছু করার নেই। ‘দিদি’ বলে দিয়েছেন, সব সিপিএমের ষড়যন্ত্র। স্কুল-কলেজের যে সব শিক্ষক, অধ্যাপক, অধ্যক্ষ ছাত্রদের হাতে বেদম মার খাচ্ছেন, তাঁরা সকলেই নিয়োগপত্র পেয়েছিলেন বাম আমলে। ‘দিদি’ বলে দিয়েছেন, বাম আমলে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি প্রশাসন, হাসপাতাল ইত্যাদিতে যাঁরা চাকরিতে ঢুকেছিলেন তাঁদের ৯৯ শতাংশই সিপিএম সমর্থক পরিবারের লোকজন। এরাই মা-মাটি- মানুষের প্রিয় সন্তানদের হাতে কিলচড় খাচ্ছে। গুরু পাপে এদের লঘু দণ্ড দিচ্ছে একদা অত্যাচারিত ছাত্রছাত্রীরা। প্রাণে মারছে না। কারণ, ‘দিদি’ বলে দিয়েছেন, ‘বদলা নয়, বদল চাই’। তাই একটু রগড়ে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী প্রতিদিন নিয়মকরে বলছেন, রাজ্যের ভাঁড়ার শূন্য। সিপিএম ২ লক্ষ কোটি টাকার বেশি ধারদেনা রেখে পালিয়েছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী প্রতিটি জেলায় দাতব্য হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাইওয়ে গড়ে দিচ্ছেন। বছরে ৫ লক্ষ বেকারকে চাকরি দিচ্ছেন। দার্জিলিংকে সুইটজারল্যান্ড এবং কলকাতাকে লন্ডন বানিয়ে দিচ্ছেন। এইসব গড়তে খরচা আছে। রাজ্য সরকারের তহবিল তো শূন্য। কেন্দ্রও হাত উপুড় করছে না। তবে কীভাবে সব হবে? আমি জানি না। তৃণমূল দিদি জানেন। দিদি-র হাতে ম্যাজিক দণ্ড আছে। সেটা ঘোরাতেই পরিবর্তন হয়ে যাবে। সোনার বাংলায় সোনার চাঁদ বাঙালিরা তখন দু’ হাত তুলে দিদি-র নামগান করবে। অবশ্য তার তেমন প্রয়োজনও নেই। ভারতে রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীরা চিরকালই প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন এমন অপবাদ কেউ দেবে না। তৃণমূল নেত্রী প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। উন্নয়নের গাজর খুড়োর কলে ঝুলিয়ে জনগণ নামক গাধাদের ছোটাচ্ছেন। উপায় নেই। সামনেই রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচন। তারপর লোকসভার। প্রতিশ্রুতির গাজর মুখের সামনে না ঝোলালে গাধারা ভোটের লাইনে দাঁড়াবে কেন? তাই আমাদের রাজ্যের ‘দিদি’ প্রতিদিনই কল্পতরু হচ্ছেন। স্বপ্ন দেখাচ্ছেন তবে ঘুম ভাঙলে স্বপ্ন আর থাকে না। জাগ্রত মানুষ স্বপ্ন দেখে না। আর রাজ্যবাসী গাধারা তো স্বপ্ন দেখাই ভুলে গেছে।

শাসক দলের হুমকিতে নতজানু হয়ে ৩১-এর ধর্মঘট প্রত্যাহার সি পি এমের

নিশাকর সোম

পরাজিত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুজফফর আহমেদ-এর স্মরণে আয়োজিত সভায় বর্তমান সরকারের সমালোচনা করে বলেছেন, ‘‘এটা সরকার নাকি ক্লাব?’’ এ সমালোচনা করার আগে পরাজিত মুখ্যমন্ত্রীর আত্মসমালোচনা করা দরকার। কেননা তাঁরই ঔদ্ধত্যের ফলে রাজ্যের বামফ্রন্টের পদযাত্রা হয়েছে। পরাজিত শিল্পমন্ত্রী এবং ব্যর্থ রাজ্য-সম্পাদক শুধু তৃণমূল সরকারের সমালোচনা করছে। এই তিনজনই হলো নাটের গুরু। এই ত্রয়ীর সঙ্গে শ্যামল চক্রবর্তীকে ধরলে দুষ্ট চতুষ্টয় যা ‘গ্যাং অফ ফোর’-নামে সুপরিচিত, তাদের অপসারণের দাবি নিচের তলার সিপিএম কর্মীদের মধ্যে শোনা যাচ্ছে।

এই প্রথম কমিউনিস্টরা তাদের ডাকা ধর্মঘট শাসকদলের হুমকিতে প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলো। এভাবে ধর্মঘট প্রত্যাহার অত্যন্ত লজ্জার কথা। ধর্মঘট ডাকার আগে চিন্তা করা উচিত ছিল।

মনে পড়ে গেল ১৯৪৮ সালের কথা। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি যখন পশ্চিমবঙ্গে বেআইনি, সেইসময় ৯ মার্চ রেল ধর্মঘট ডাকা হয়। সেই ধর্মঘট তদানীন্তন সরকার ভেঙে দেয় লাঠি, গুলি, গ্রেপ্তার ও চাকরি থেকে শত শত কর্মীকে বরখাস্ত করে। তবুও সেই ধর্মঘট প্রত্যাহার করেনি তখনকার কমিউনিস্টরা। তারই ফসল ছিল রেলকর্মী নির্বাচন থেকে জ্যোতি বসুর বিধানসভায় নির্বাচিত হওয়া। বর্তমানে ৩১ জুলাইয়ের ধর্মঘট ডেকে সিপিএম বিচ্ছিন্ন হয়েছে। নতজানু হয়ে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে শাসকদলকে জানিয়ে দিয়েছে— ‘হুমকির কাছে মাথা নত করে দিলাম।’

রাজ্য রাজনীতি

দার্জিলিঙে জিটিএ নির্বাচনে জিতে মোর্চা দার্জিলিং জয় করে নিল। এখানেও সিপিএমের দীনতা প্রকট। দার্জিলিং জেলা পার্টির দেখার দায়িত্ব ছিল জ্যোতি বসুর। তিনি তাঁর বন্ধু রতনলাল ব্রাহ্মণ-এর কথা মতো পার্টি দেখতেন। জ্যোতি-সুহৃদ রতনলাল ব্রাহ্মণ-এর ‘কৃপা’য় দার্জিলিং-এ সমতল-পাহাড় দ্বন্দ্ব শুরু হলো। পাহাড়ের নেতাদের মধ্যেও দলাদলি আরম্ভ হলো। এরপর জ্যোতিবাবুর বদলে বুদ্ধবাবুর দায়িত্ব হলো দার্জিলিং পার্টির (সিপিএম) দেখাশোনা করার। বুদ্ধবাবু তাঁর প্রিয় অশোক ভট্টাচার্যকে দায়িত্ব দিয়ে নিজের বোঝা নামিয়ে দিলেন। ঘিসিংদের সঙ্গে বহু ঘেঁষাঘেঁষির পর কিছু দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয় সিপিএম। তখন যদি জিটিএ ধাঁচের একটা ব্যবস্থা মেনে নেওয়া হোত, তাহলে আজ দার্জিলিং মোর্চার সাম্রাজ্যে পরিণত হোত না। আর কোনওদিন সিপিএম পাহাড়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। মোর্চা-নেতারা ঘোষণা করেছেন, ‘যতদিন তৃণমূল সরকার থাকবে ততদিন দার্জিলিঙে শান্তি থাকবে।’ এটা সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক বক্তব্য। সিপিএমের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য আজ এই দশা। রাজ্যের শাসকদলের মনে রাখা উচিত— দার্জিলিঙে ‘শেষ কথা মোর্চা।’

মুখ্যমন্ত্রী জেলায় জেলায় সফর করে প্রশাসনকে চাঙ্গা করার কর্মসূচী নিয়েছেন। এর ফলে রাজ্যের কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গের সৌন্দর্য্য অবলোকনের দৃশ্য তাঁর সফরসঙ্গী ‘সাংসদ-সাংবাদিকে’র ক্যামেরায় বন্দি হয়ে তৃণমূলের দৈনিক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় শোভা পাচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর সফরের মাধ্যমে এই বার্তা দেওয়া হচ্ছে যে তিনিই এই শাসনের সুপ্রিমো। তাঁর কথা না শুনলে বদলি করা হবে।

মতুয়ামন্ত্রীও তাঁর কথায় শিল্পের জমিতে প্রমোটারি করতে না দেওয়াতে তাঁর সচিব যাকে বুলডোজার লেডি বলা হয়, তাকে বদলি করে দিয়েছেন। এই নজির এখন বিরল নয়। ডি সি ডি ডি দময়ন্তী সেন-কে মুখ্যমন্ত্রী এক গুরুত্বহীন স্থানে বদলি করে দিয়েছেন।

আনন্দ সংবাদ

ভগবান শ্রী শ্রীকৃষ্ণের

আনুমানিক ৫২৪০তম
জন্মজয়ন্তী উৎসব
পালিত হলো গত

২৪শে শ্রাবণ, ১৪১৯
(৯ আগষ্ট, ২০১২)
বৃহস্পতিবার

—: স্থান :—

রাধাগোবিন্দ ভবন

টি-৪৭, তেঘরিয়া
রাজারহাট রোড
কলকাতা-৭০০১৫৭
ফোন : ৯৩৩১৯০৪৮৫৯

টাকার অবমূল্যায়ন : অর্থনীতির অশনিসংকেত

অম্লানকুসুম ঘোষ

> বিশ্ববাজারে প্রতিমুহূর্তে সমান্তরালভাবে একদিকে বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে ভারতীয় টাকা কেনা ও অন্যদিকে ভারতীয় টাকার বিনিময়ে বিদেশী মুদ্রা কেনা হচ্ছে। তাহলে তো আন্তর্জাতিক মুদ্রাবাজারে ভারতীয় টাকা ও বিদেশী মুদ্রার আপেক্ষিক মূল্যের একটা স্থিতাবস্থা থাকা উচিত। কিন্তু তা না হয়ে ভারতীয় টাকার আপেক্ষিক মূল্য অন্যান্য বিদেশী মুদ্রার তুলনায় ক্রমশ কমছে।

অর্থনীতিতে বিনিময়ের মাধ্যম হলো মুদ্রা। কোনও দেশের অর্থনীতি কতটা উন্নত তা বোঝা যায় বিশ্বের বাজারে সেই দেশের মুদ্রা কতটা গুরুত্ব পাচ্ছে তা দেখে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় মুদ্রা টাকার মূল্য ক্রমহ্রাসমান। গত বছর এই সময় এক ডলারের সমমূল্য ছিল পঁয়তাল্লিশ টাকার কাছাকাছি। বর্তমানে সেখানে এক ডলারের মূল্য তিপ্পান্ন টাকা থেকে সাতান্ন টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। টাকার এই অবমূল্যায়ন ভারতীয় অর্থনীতির দুর্বলতাকেই প্রকট করেছে। ভারতীয় অর্থনীতি বর্তমানে মন্দাক্রান্ত, তার ওপর টাকার এই ক্রমাবনতি ভারতীয় অর্থনীতির ভবিষ্যৎ আকাশকেও করে তুলেছে অন্ধকার।

দেখা যাক আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় টাকার মূল্যের অবনমন হলো কেন। আন্তর্জাতিক বাজারে যে কোনও মুদ্রার মূল্য নির্ধারিত হয় অন্য দেশের মুদ্রার সাপেক্ষে, সেই দেশের মুদ্রার চাহিদার ওপর নির্ভর করে। অর্থাৎ বলা যায় ডলারের বা ইউরোর তুলনায় টাকার দাম কমেছে কারণ বিশ্ববাজারে ডলার এবং ইউরোর তুলনায় টাকার আপেক্ষিক চাহিদা কমে গেছে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মুদ্রা-বিনিময় বাজারে মোট যত পরিমাণ টাকা বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থা বা দেশ কিনছে তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা টাকার বিনিময়ে কেনা হচ্ছে। এখন দেখা যাক বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে ভারতীয় টাকা কেনে কারা? প্রথমত, রপ্তানিকারীরা, তারা তাদের রপ্তানিজাত দ্রব্যের দাম বিদেশী মুদ্রায় পায় এবং সেই বিদেশী মুদ্রা বিক্রি করে ভারতীয় টাকা কেনে, ভারতীয় বাজার থেকে কাঁচামাল কেনবার ও কর্মীদের বেতন দেবার জন্য। দ্বিতীয়ত, ভারত ভ্রমণে আসা বিদেশী পর্যটকরা ও ভারতে অধ্যয়নে আসা ছাত্রেরা তাদের দেশের মুদ্রার বিনিময়ে ভারতীয় টাকা কেনে এদেশে তাদের খরচ চালাবার জন্য। তৃতীয়ত, বিদেশে বসবাসরত প্রবাসী ভারতীয়রা ভারতে বসবাসরত আত্মীয়বন্ধুদের যখন টাকা পাঠায় তখন তাদের সে দেশের মুদ্রার বিনিময়ে ভারতীয় টাকা কিনতে হয়। দেখা যাক, ভারতীয় টাকার বিনিময়ে বিদেশী মুদ্রা কিনছে কারা। প্রথমত, আমদানিকারীরা তাদের আমদানি করা দ্রব্যের দাম মেটানোর জন্য ভারতীয় টাকার বদলে বিদেশী মুদ্রা কিনতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় পর্যটকরা বিদেশভ্রমণকালে ও ভারতীয় ছাত্ররা বিদেশে অধ্যয়নকালে সেখানকার খরচ মেটানোর জন্য ভারতীয় টাকার বদলে বিদেশী মুদ্রা কিনতে বাধ্য হয়। তৃতীয়ত, ভারতে বসবাসকারী অনেক বিদেশী তাদের নিজেদের দেশে আত্মীয়বন্ধুদের কাছে অর্থ পাঠায় তখন তারা ভারতীয় টাকার বিনিময়ে বিদেশী মুদ্রা কেনে। চতুর্থত, অনেক ভারতীয় স্বনামে বা বেনামে বিদেশের ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে সেখানে অর্থ রাখে তখন তারা ভারতীয় টাকার বদলে বিদেশী মুদ্রা কেনে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে বিশ্ববাজারে প্রতিমুহূর্তে সমান্তরালভাবে একদিকে বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে ভারতীয় টাকা কেনা ও অন্যদিকে ভারতীয় টাকার বিনিময়ে বিদেশী মুদ্রা কেনা হচ্ছে। তাহলে তো আন্তর্জাতিক মুদ্রাবাজারে ভারতীয় টাকা ও বিদেশী মুদ্রার আপেক্ষিক মূল্যের একটা স্থিতাবস্থা থাকা উচিত। কিন্তু তা না হয়ে ভারতীয় টাকার আপেক্ষিক মূল্য অন্যান্য বিদেশী মুদ্রার তুলনায় ক্রমশ কমছে।

বর্তমানে ভারতীয় টাকার সাপেক্ষে বিদেশী মুদ্রার চাহিদা বাড়ার কারণগুলি দেখা যাক। প্রথমত, দেশে একশ্রেণীর লোকের হাতে প্রচুর কালো টাকা সঞ্চিত হয়েছে, এই টাকা তারা ভারতীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখছে না, তাতে ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে, তাই তারা এই বিপুল পরিমাণ অর্থ স্বনামে বা বেনামে বিদেশের ব্যাঙ্কে রাখছে, আর তা করতে গিয়ে তাদের ভারতীয় টাকা বিক্রি করে বিদেশী মুদ্রা কিনতে হয়। ফলে আন্তর্জাতিক মুদ্রার চাহিদা বাড়ে। ফলে বিদেশী মুদ্রার অনুপাতে ভারতীয় টাকার দাম কমে যায়।

দ্বিতীয়ত, ভারত অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া দেশ হলেও ভারতের কিছু লোক মাত্রাতিরিক্ত ধনী। এই ধনী সম্প্রদায় প্রায়ই বিদেশভ্রমণে যায়। অনেকে আবার বছরের বেশিরভাগ সময়টাই কাটায় বিদেশে, ফলে এদের বিলাসবহুল জীবনের বিলাসজনিত ব্যয়ের অধিকাংশই খরচ হয় বিদেশে। স্বভাবতঃই এই খরচ করতে হয় বিদেশী মুদ্রায়। তাই এদের প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা কিনতে হয় ভারতীয় টাকার বিনিময়ে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় টাকার তুলনায় বিদেশী মুদ্রার চাহিদা বাড়ে।

তৃতীয়ত, দেশের অপেক্ষাকৃত বেশি মেধাবী এবং সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের একটা বড় অংশ প্রতি বছর উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাড়ি দেয়। বিদেশের ব্যয়বহুল উচ্চশিক্ষার খরচ মেটানোর জন্য তাদের ভারতীয় টাকার বিনিময়ে প্রচুর বিদেশী মুদ্রা কিনতে হয়। আবার ভারতের বেহাল শিক্ষাব্যবস্থার জন্য বিদেশী ছাত্রদের ভারতে আসার সংখ্যাও কমছে, ফলে ভারতীয় টাকার চাহিদাও

কমছে। ফলে আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারে ভারতীয় টাকার তুলনায় বিদেশী মুদ্রার চাহিদা বাড়ে।

চতুর্থত, গত বছর দুয়েক ধরে দেশে মুদ্রাস্ফীতি খুব বেশি থাকায় মুদ্রাস্ফীতিতে লাগাম দেওয়ার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রেপো ও রিভার্স রেপো রেট অনেকবার বাড়িয়েছে। এর ফলে দেশের সব ক'টি ব্যাঙ্ক সুদের হার অনেক বাড়াতে বাধ্য হয়েছে। সুদের হার বেশি হওয়ায় শিল্পসংস্থাগুলি অনেক সময় ঋণ নিতে পারছে না। ফলে তাদের বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে। ফলে দেশের শিল্পোৎপাদন কমে যাচ্ছে এবং রপ্তানিযোগ্য শিল্পসামগ্রীর উৎপাদনও কমছে। রপ্তানি কমার ফলে দেশে বিদেশী মুদ্রার আগমন হ্রাস পেয়েছে, ফলে আন্তর্জাতিক মুদ্রাবাজারে বিদেশী মুদ্রার তুলনায় ভারতীয় টাকার চাহিদা ও দাম কমে গেছে।

স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে যে নানাবিধ কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় টাকার মূল্য বাড়লে বা কমলে সাধারণ মানুষের কী লাভ বা ক্ষতি হয়? আপাতদৃষ্টিতে দুর্বোধ্য মনে হলেও বিশ্ববাজারে টাকার মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবনেও প্রভাব ফেলে। কীভাবে এবং কী কী প্রভাব ফেলে দেখা যাক।

প্রথমত, ভারতে শিল্পায়নের এখন মধ্য পর্যায়। প্রথম বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলির মতো শিল্পে সম্পৃক্ত অবস্থা ভারতের নয়, আবার তৃতীয় বিশ্বের অন্য অনেক দেশের মতো ভারত শিল্পে পশ্চাৎপদও নয়। এই সময় ভারতে প্রাথমিক স্তরের বৃহৎ শিল্প বেশ কিছু বর্তমান। দ্বিতীয় স্তরের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের স্থাপন সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে হচ্ছে।

কিন্তু এই শিল্পগুলি স্থাপন করতে গেলে যে উন্নত যন্ত্রাংশ প্রয়োজন তা শিল্পোন্নত প্রথম বিশ্ব থেকে বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে কিনে আনতে হয়। ভারতীয় টাকার তুলনায় বিদেশী মুদ্রার দাম বেড়ে গেলে এই যন্ত্রাংশ আমদানীর খরচ বাড়ে, ফলে দেশে শিল্পায়নের গতি হ্রাস পায়। ফলে সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে। এই ব্যাপারটা চক্রাকারে আবর্তিত হয়। অর্থনীতির পরিভাষায় একেই 'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র' বলা হয়। এই অবস্থা থেকে বেরোতে না পারলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সুদূরপরাহত হয় ও সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, ভারত পেট্রোলিয়াম উৎপাদনে স্বনির্ভর নয়। ভারতকে প্রচুর পরিমাণ পেট্রোলিয়াম বিদেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে আমদানি করতে হয়। ভারতীয় টাকার সাপেক্ষে বিদেশী মুদ্রার দাম বাড়লে এই পেট্রোলিয়াম আমদানির খরচ বাড়ে। ফলে দেশে পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের দাম বাড়ে। ফলে জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে,কারণ তাদের অপেক্ষাকৃত বেশী মূল্যে বিভিন্ন জিনিস কিনতে হচ্ছে।

তৃতীয়ত, শুধু অর্থনীতির ক্ষেত্রে নয় স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়ে। অনেক জীবনদায়ী ওষুধ আমাদের বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। বিদেশী মুদ্রার সাপেক্ষে ভারতীয় টাকার দাম হ্রাস পেলে এই ওষুধগুলি আমদানি করার ব্যয় বেড়ে যাবে। ফলে সাধারণ মানুষকে ওইসব ওষুধ বেশি মূল্যে কিনতে হবে ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

চতুর্থত, শিক্ষাক্ষেত্রেও টাকার মূল্যহ্রাসের বিরাট প্রভাব পড়ে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য মেধাবী ছাত্রদের একটা অংশ বিদেশের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গমন করে। বিদেশী মুদ্রার সাপেক্ষে ভারতীয় টাকার আপেক্ষিক মূল্য হ্রাস পাওয়ার ফলে তাদের বিদেশে শিক্ষাগ্রহণ অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহুল হয়ে যায়। ফলে তারা বাধ্য হয়ে বিদেশে শিক্ষাগ্রহণে বিরত থাকে। দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়। দেশের মানবসম্পদের ওপর টাকার মূল্যহ্রাসের আরেকটি প্রভাব পড়ে। ভারতীয় টাকার তুলনায় বিদেশী মুদ্রার আপেক্ষিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অধ্যাপক ও গবেষকদের বিদেশী মুদ্রায় প্রদেয় সাম্মানিকের আপেক্ষিক মূল্য ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অধ্যাপক ও গবেষকদের ভারতীয় মুদ্রায় প্রদেয় সাম্মানিকের তুলনায় বেশি হয়। ফলে ভারতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ গবেষক ও অধ্যাপকদের একটা বড় অংশ বিদেশে চলে যেতে বাধ্য হন। ফলে দেশের মানবসম্পদের বহিঃনির্গমন ঘটে। যাকে ব্রেন ড্রেন বলা হয়। এর ফলে দেশের সার্বিক ক্ষতি হয়। দেখা গেল বিদেশী মুদ্রার সাপেক্ষে ভারতীয় টাকার মূল্যহ্রাসের ফলে অর্থনীতির বিচিত্রগামী পথে নানাভাবে জনসাধারণ বিপন্ন হচ্ছে। অর্থনীতিও ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে সর্বনামের অতল গহ্বরে। জানতে ইচ্ছে হয় অর্থনীতির এই সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে সরকার বা রাষ্ট্রের কি কিছু করণীয় আছে? কি কি করণীয় আছে একটু দেখা যাক।

প্রথমত, সরকার বিদেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের দ্বারা গচ্ছিত কালো টাকা উদ্ধার করে দেশে ফেরৎ আনতে পারে। কাজটা দুঃসাধ্য কিন্তু অসাধ্য নয়। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক স্তরে বোঝাপড়ার মাধ্যমে মোট কালো টাকার সম্পূর্ণ না হলেও একটা বড় অংশ দেশে ফিরিয়ে আনা যায়। এর ফলে ত্রিবিধ লাভ হবে। (১) এর ফলে বিদেশী মুদ্রায় সঞ্চিত কালো টাকা আবার সরাসরি ভারতীয় মুদ্রায় পুনঃপরিবর্তিত হবে, ফলে ভারতীয় টাকার চাহিদা আন্তর্জাতিক মুদ্রাবাজারে বাড়বে। (২) এই টাকা সরকারি কোষাগারে আসবে ফলে সরকারের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত হবে। সরকার পরিকাঠামো খাতে প্রচুর ব্যয় করে দেশের পরিকাঠামোকে উন্নত করতে পারবে। ফলে দেশের কৃষি, শিল্প ও পরিবহণের উন্নতি হবে, ফলে উৎপাদন বাড়বে ও উৎপাদিত শিল্পজাত ও কৃষিজাত বস্তু বাজারজাত করার সুযোগও বাড়বে। এর ফলে রপ্তানি বাড়বে। রপ্তানি বাড়লে ভারতীয় টাকার চাহিদা বাড়বে ফলে আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারে ভারতীয় টাকার দাম বাড়বে। (৩) ভারতীয় মুদ্রায় রূপান্তরিত সেই বিপুল পরিমাণ টাকা ভারতের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে বিশেষতঃ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে আমানত হিসেবে রাখা হবে। ফলে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির ঋণদান ক্ষমতা বাড়বে। ফলে শিল্পক্ষেত্র ও কৃষিক্ষেত্র বেশি ঋণ পাবে। ফলে দেশের শিল্প ও কৃষি বিশেষ করে ক্ষুদ্র, কুটীর ও মাঝারি শিল্প এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি জোতের কৃষিক্ষেত্র বিকশিত হবার সুযোগ পাবে। ফলে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বাড়বে ও রপ্তানি বাড়বে। ফলস্বরূপ আন্তর্জাতিক মুদ্রা-বাজারে ভারতীয় টাকার চাহিদা বাড়বে ও তার ফলে টাকার দাম বাড়বে।

দ্বিতীয়ত, সরকার দেশের নাগরিকদের যথেচ্ছ বিদেশভ্রমণ ও বিদেশে বিলাসিতা খাতে প্রচুর ব্যয়ের ওপর বিধিনিষেধ জারি করতে পারে। এ সংক্রান্ত কিছু আইন আছে কিন্তু তা খুবই শিথিল। দেশের স্বার্থে এই আইনগুলি আরও কড়া করা উচিত ও সেই আইনগুলির নিখুঁত প্রয়োগ করা উচিত। তার ফলে ভারতীয় টাকা বিক্রি করে বিদেশী মুদ্রা কেনা কমবে। ফলে আন্তর্জাতিক মুদ্রাবাজারে টাকার মূল্যহ্রাস কিছুটা হলেও বন্ধ হবে।

তৃতীয়ত, সরকারের উচিত দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নত করা। শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতির হস্তক্ষেপ, দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ এই ত্রিবিধ আগ্রাসনে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই তিন বাধাকে দূর করে শিক্ষাব্যবস্থাকে যদি উন্নত করে তোলা যায় তাহলে দেশের মেধাবী ছাত্ররা বিদেশে পড়তে না গিয়ে দেশেই পড়াশোনা করবে, ফলে দেশের প্রচুর বিদেশী মুদ্রা বেঁচে যাবে এবং বিদেশী ছাত্ররাও আরও বেশি সংখ্যায় ভারতে পড়তে আসবে ও তারা ভারতীয় টাকা কিনতে বাধ্য হবে। ফলে টাকার অবমূল্যায়ন ঘটা বন্ধ হবে।

কিন্তু যদি উপরিউক্ত ব্যবস্থাগুলি না নেওয়া হয়? দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিকরা যদি নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে দেশের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি না দেন? তা হলে জাতীয় অর্থনীতির শেষের সেদিন বড় ভয়ংকর হবে। □

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনা ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

সুতপা চক্রবর্তী

“বিশ্বমনীষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ শ্রীমদভগবদ্‌গীতা ভারতীয় শাশ্বত সংস্কৃতির নির্যাস। জগতের সারস্বত সমাজে ভারতের শ্রেষ্ঠ দান।” ‘হিন্দুশাস্ত্র’ গ্রন্থে এই মূল্যায়ন করেছেন মনীষী রমেশ চন্দ্র দত্ত। প্রকৃত অর্থেই গীতার বাণী এমনই সর্বজনীন যে সারা বিশ্বের নরনারী নির্বিশেষে গীতার থেকে জীবনের পাথেয় পেয়ে থাকেন।

উল্লেখ্য, বেদ এবং উপনিষদ শান্ত তপোবনের আরণ্যক পরিবেশে সাধক ঋষির ধ্যানদৃষ্টি থেকে সঞ্জাত। কিন্তু গীতা ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধপ্রান্তরে, কুটিল রাজনৈতিক বাতাবরণে, বিষণ্ণ যুদ্ধ-পরাঙ্মুখ সেনানী অর্জুনকে বিষাদমুক্ত এবং যুদ্ধ উন্মুখ করার উদ্দেশ্যে পার্থসারথি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উপদিষ্ট, এই গীতাই আবার উপনিষদের সারসত্তা হিসাবে মান্য।

এই কারণে গীতা একদিকে যেমন মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের দিশা, অপরদিকে রাষ্ট্রীয় মুক্তিসংগ্রামের আলোকবর্তিকা। মহাত্মা গান্ধী, আচার্য বিনোবা ভাবের মতো অহিংসা আন্দোলনপন্থী এবং বাল গঙ্গাধর তিলক, ঋষি অরবিন্দ, লালা লাজপত রায়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, বিপ্লবী কানাইলাল, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্লচাকী ও এঁদের মতো আরও বহু সশস্ত্র বিপ্লব পন্থী স্বাধীনতা সংগ্রামী গীতাকেই তাঁদের রাজনৈতিক কর্মজীবনের প্রেরণা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন একথা প্রমাণিত সত্য।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ‘নবজাগরণ’ সংস্কৃতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের প্রাণপুরুষ, ব্রাহ্ম-আন্দোলনের অন্যতম নেতা, রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং গীতা অনুরাগী ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় গীতার শ্লোক উদ্ধৃতিসহ ব্যাখ্যা করতেন। রবীন্দ্র অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ‘গীতাপাঠ’ নাম একখানি গ্রন্থ লেখেন। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ গীতার পদ্য অনুবাদ প্রকাশ করেন। নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লোকমান্য তিলকের ‘গীতারহস্য’ নামক ভাষ্যটি মূল মারাঠি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথও মহর্ষি পিতার সাহচর্যে কিশোর বয়স থেকেই ‘গীতা’ গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকেন। ‘জীবনস্মৃতি’ গ্রন্থে কবি এ বিষয়ে আলোকপাত করে লিখছেন— “ভগবদ্‌গীতায় পিতার মনের মতো শ্লোকগুলো চিহ্নিত করা ছিল, সেইগুলো বাংলা অনুবাদ সমেত আমাকে কপি করতে দিয়েছিলেন।” দেখা যাচ্ছে ঠাকুর পরিবারেও গীতা গরিমা এক ঐতিহাসিক গুরুত্বে আলোচিত হচ্ছে।

সমগুরুত্বেই জ্বলে ওঠে স্বদেশ চেতনার স্ফুলিঙ্গ এই ঠাকুর পরিবারেই, এটি ছিল তৎকালীন রাজনীতি চর্চারও অন্যতম পীঠস্থান। মহর্ষির অনুপ্রেরণায় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ও ভ্রাতুষ্পুত্র গুণেন্দ্রনাথের সহযোগিতায় নবগোপাল মিত্র ‘হিন্দুমেলা’ নামে একটি স্বদেশী মেলা প্রবর্তন করেন। কিশোর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিবারের অন্যান্য অগ্রজ সদস্যসহ ‘হিন্দুমেলা’ ও ‘সঞ্জীবনী সভার’ সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে রচনা করেন ‘হিন্দুমেলার উপহার’ কবিতাটি। ১৭ বছর বয়সে মেলার একাদশ অধিবেশনে পাঠ করেন ‘দিল্লীর দরবার’ বিষয়ক কবিতা। ১৬ বছর বয়সে ‘সঞ্জীবনী সভা’ উপলক্ষেই সম্ভবত তাঁর প্রথম স্বদেশী সঙ্গীতটি রচিত হয়— ‘তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ’।

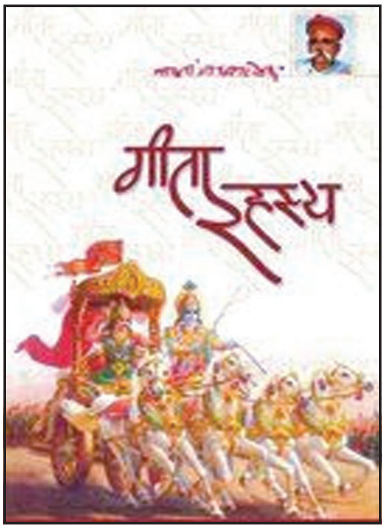

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাধারার সম্যক পরিচয় লাভ করা যায় রবীন্দ্রনাথকৃত এই বক্তব্যের মাধ্যমে— “আমাদের পিতৃদেব যখন স্বদেশের প্রচলিত পূজাবিধি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তখনও তিনি স্বদেশী শাস্ত্রকে ত্যাগ করেন নাই ও স্বদেশী সমাজকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়াছিলেন।”

(সূত্র : রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্বদেশ চেতনা, ডঃ সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়)

ভারতের ঐতিহ্য ও স্বাদেশিকতা সম্বন্ধে পূর্ণসচেতন মহর্ষি পরিবারের সদস্যদের ব্রহ্মসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে সমমর্যাদায় স্বদেশী সঙ্গীত রচনায় উৎসাহ দান করতে থাকেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ‘হিন্দুমেলা’ এবং তৎকালীন ভারতের অন্যান্য স্বাদেশিক আন্দোলন, বা পরবর্তীকালের কংগ্রেস আন্দোলন— সবই ছিল হিন্দু আদর্শের প্রধান্য। ত্রয়োদশ শতক থেকে মুসলমান শাসকদের অপশাসনে হতাশা ক্লিষ্ট সংখ্যাগুরু হিন্দু ভারতবাসীর ক্ষেত্রে স্বাধীন ভারতের আদর্শ ছিল প্রাক্-মুসলমান যুগের ঐতিহ্যময় ভারত, যা আর্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত। গণপতি উৎসব, গো-রক্ষণ সভা হিন্দু সংস্কৃতির আদর্শে গঠিত। ‘বন্দেমাতরম্’ মন্ত্রে দেশকে মাতৃরূপে সম্বোধন, হিন্দু ধারণারই ফল।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের (বঙ্গভঙ্গের পূর্বকাল পর্যন্ত) স্বদেশাত্মক গান এই আদর্শ প্রভাবিত, এবং গানে বেদ-উপনিষদ তপোবন নিয়ন্ত্রিত ভারতবর্ষের চিত্রই প্রতিবিম্বিত। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ্য এই গানগুলি— ‘ভারত রে তোর কলঙ্কিত পরমাণু রাশি’, ‘অয়ি বিষাদিনী বীণা’, ‘ঢাকো রে মুখ চন্দ্রমা’, ‘অয়ি ভুবনমনোমোহিনী’ ইত্যাদি।

কিন্তু এর পরের যুগে ‘বঙ্গভঙ্গ’ ও তার পরবর্তী সময়ে কবি তাঁর স্বদেশাত্মক রচনায় কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের ভাবাদর্শকে আশ্রয় করেননি। এই সময়ের গান আরও ব্যাপ্ত ও বৃহৎ এক সত্যের আশ্রয়ে রচিত, যাঁকে কবি মনে করেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সব মানুষের নিয়ন্তা। সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনার বীজ ছিল দেশজ। যা অনেকাংশে গীতার ভাবানুসারী। যদিও তার প্রয়োগ ছিল রাবীন্দ্রিক শৈলী সমৃদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে পারিবারিক শিক্ষা এবং দীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ তরুণ বয়স থেকেই গীতার তত্ত্ব এবং যুক্তিসংগ্রামে গীতার দার্শনিক ভূমিকা উভয় সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন।

কবির বিপুল রচনা সম্ভারে এর প্রমাণ জড়িয়ে আছে। তাঁর প্রবন্ধ, উপন্যাস ও অন্যান্য সাহিত্য সর্বোপরি সঙ্গীত গীতার ভাবনা দ্বারা অনুপুষ্ট। তবে গীতার সমস্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কবির স্বীয় মৌলিকত্বে ভাস্বর। গীতা মহিমা সম্পর্কে তাঁর কিছু উক্তি স্মরণযোগ্য। ‘সমাজ’গ্রন্থে তিনি বলছেন— “শ্রীকৃষ্ণ কর্মকে মানুষের শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহার কারণ কি? তাহার কারণ এই যে, কর্মেই মানুষের কর্তৃত্ব শক্তি বা আধ্যাত্মিকতার বল বৃদ্ধি হয়। কর্মেই মনুষ্যের সমুদয় প্রবৃত্তি পরিচালনা করিতে হয় এবং সংযতও করিতে হয়,— প্রবৃত্তির সাহায্যে কর্মের সাধনা এবং কর্মের দ্বারা প্রবৃত্তির দমনই সর্বোৎকৃষ্ট।”

‘পরিচয়’ গ্রন্থে ‘ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা’ প্রবন্ধে গীতার স্বরূপ সম্বন্ধে কবির উক্তি হলো— “আতস কাঁচের এক পিঠে যেমন ব্যাপ্ত সূর্যালোক এবং আর এক পিঠে যেমন তাহারই সমস্তটির একটি সংহত জ্যোতি— সেই জ্যোতিটি ভগবদ্‌গীতা। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির যে সমন্বয় যোগ তাহাই সমস্ত ভারত ইতিহাসের চরমতত্ত্ব।”

সামগ্রিক জীবনের সমন্বয়, তথ্যের মাধ্যমে তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা এই ভারতের সাধনা। ভারতের রাষ্ট্রসাধকেরা সেই সাধনাই করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘মহাত্মা গান্ধী’ প্রবন্ধে এইরকম অভিমতই ব্যক্ত করেছেন— ‘উদার কাব্য পরিধির মধ্যে, ভারতের চিত্তভূমির মাঝখানে এই তত্ত্বকথার অবতারণার প্রয়োজন ছিল।— মহাভারতের মাঝখানে গীতাই প্রাচীনের সেই সমন্বয় তত্ত্বকে উজ্জ্বল করে।’

‘ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা’ প্রবন্ধে কবিগুরু বলেছেন—

‘অনেক মনে করেন পথের ইতিহাসই ইতিহাস, মূলে অভিপ্রায় ও চরম গম্যস্থান বলিয়া কিছুই নাই। কিন্তু ভারতবর্ষ একদিন আপনার সমস্ত ইতিহাসের একটি চরম তত্ত্বকে দেখিয়াছিল, মহাভারত সকল পথের চৌমাথায় সেই চরম লক্ষ্যের আলোকটি জ্বালাইয়া ধরিয়াছে, তাহাই গীতা।’

‘প্রাচীন সাহিত্য’ গ্রন্থের ‘কাদম্বরী চিত্র’ প্রবন্ধে বলছেন—

“ভগবদ্‌গীতার মাহাত্ম্য কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিন্তু, যখন কুরুক্ষেত্রের তুমুল যুদ্ধ আসন্ন তখন সমগ্র ভগবদ্‌গীতা অবহিত হইয়া শ্রবণ করিতে পারে, ভারতবর্ষ ছাড়া এমন দেশ জগতে নাই।”

সেই জন্যেই যুগে যুগে ভারত সৈনিকদের মানসিক শক্তির প্রেরণা গীতা।

‘কালান্তর’ প্রবন্ধেও গীতার অনুষঙ্গ এসেছে বার বার।

তৎকালীন রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের পটভূমিকায় রচিত দুটি উপন্যাস ‘ঘরে বাইরে’ ও ‘চার অধ্যায়’। উপন্যাসের চরিত্ররা গীতাতত্ত্ব সম্পর্কে ভাবিত। ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসের বিমলার মুখে উচ্চারিত হয় গীতার শ্লোকাংশ ‘ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে’। স্বদেশী করা কিশোর অমূল্যর পকেট থেকে বেরিয়ে আসে দুটি বস্তু— (১) গীতা (২) আগ্নেয়াস্ত্র। অমূল্য বিশ্বাস রাখে গীতায়, কারণ “গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, আত্মাকে তো মারতে পারে না।” ‘ঘরে বাইরে’-র অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র সন্দীপ যার বহিরাঙ্গে দেশপ্রেমীর পোশাক, অন্তরে লোভলালসার লেলিহান শিখা জ্বলছে। সেই তাঁর আত্মকথনে গীতার প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। সন্দীপের উক্তি—“ভারতবর্ষে আমার জন্ম; সাত্ত্বিকতার বীজ রক্তের মধ্যে থেকে একেবারে মরতে চায় না। আপনাকে বঞ্চিত করার পথে চলা যে পাগলামি একথা মুখে যতই বলি এটাকে একেবারে উড়িয়ে দেবার সাধ্য নেই। ...ধর্মের ধুয়ো দেশের ধুয়ো দুটিকেই পুরোদমে একসঙ্গে চালাচ্ছি। ভগবদ্‌গীতা এবং বন্দেমাতরং আমাদের দুই-ই চাই।”

অন্যপ্রসঙ্গেও সন্দীপ গীতার উল্লেখ করেছে।

‘চার অধ্যায়’ উপন্যাসের চরিত্র ইন্দ্রনাথ অপর চরিত্র এলার সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গে গীতার প্রসঙ্গ এনেছেন— “বৎসে, এই যে ধিক্‌কার এটাই কুরুক্ষেত্রের উপক্রমণিকা। অর্জুনের মনেও ক্ষোভ জেগেছিল।” অন্য প্রসঙ্গে বলেছেন— “শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথাটাই বুঝিয়েছিলেন। নির্দয় হবে না কিন্তু কর্তব্যের বেলা নির্মম হতে হবে।” অপর চরিত্র অতীন এলার সঙ্গে আলোচনায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের উল্লেখ করেছেন— “শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বীরের কর্তব্যই করতে বলেছিলেন অত্যন্ত অরুচি সত্ত্বেও”। প্রসঙ্গান্তরে বলছেন “সব মানুষের সামনেই ধর্মক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধ আছে, সেখানে মৃতো বাপিতেন লোকত্রয়ং জিতং।”

ছোটগল্প ‘সংস্কার’-এ গল্পকার গিরীন্দ্রের বক্তব্য থেকে জানা যাচ্ছে— “তখনকার পুলিশ কারও বাড়ীতে গীতা দেখলেই সিডিশনের প্রমাণ পেত।” অপর একটি ছোটগল্প ‘নামঞ্জুর গল্প’। সেখানে স্বদেশব্রতী কথক সংকটকালে গীতা ‘আওড়াতে’ থাকেন।

প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্পের পরিধি পার হয়ে কবির স্বদেশাত্মক সঙ্গীত-সৃষ্টির ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে স্থান করে নিয়েছে গীতার অনুভাবনা।

শ্রীমৎ ভগবদ্‌গীতার প্রথম শ্লোক :

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসব।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়।।

অর্থাৎ কৌরব-পাণ্ডব মহাদ্বৈরথ কোথায় অনুষ্ঠিত হতে বলেছে— ‘ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে’। অতএব এই মহাযুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ। কৌরব বংশের লোভ, ঔদ্ধত্য, অপশাসন, প্রবঞ্চনা ইত্যাদির বিরুদ্ধে পাণ্ডবদের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই, সর্বোপরি শান্তি ও ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার লড়াই। আর সেই যুদ্ধে পাণ্ডবদের সারথি বা বৌদ্ধিক নেতা কে?— যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ।

ভারতবর্ষ যুগে যুগে ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। ভারতের স্বদেশাত্মক আন্দোলন ধর্মযুদ্ধেরই ইঙ্গিতবাহী। নূতন যুগ নূতন কাল, ধর্মযুদ্ধের স্বরূপ এক, সেনানী-মুক্তিকামী ভারতবাসী, অন্যতম এক সারথি— যোগনিষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ।

কেবলমাত্র অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা করায়ত্ত করা কোনও ধর্মযুদ্ধের মূল লক্ষ্য হতে পারে না, তার লক্ষ্য— নীতি

এবং মূল্যবোধের মাধ্যমে মানব-মুক্তির সাধনা। সেই কারণে এই যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র— জ্ঞান, সংযম, বিচার, বিবেক। আর সমর সেনানীকে হতে হয় নিষ্কাম কর্মযোগী স্থিতপ্রজ্ঞ, জয়-পরাজয়ে, শত্রু-মিত্রে, নিন্দা-স্তুতিতে সমচিত্ত এবং আত্মজ্ঞানপরায়ণ। যাতে সে অর্জুনের মতো বলতে পারে—

'নষ্টো মোহঃ স্মৃতিলব্ধা ত্বৎ প্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।। (১৮/৭৩)

হে অচ্যুত, আপনার প্রসাদে আমার মোহ ও অজ্ঞান নষ্ট হয়েছে, আমার পরমাত্মা বিষয়ক ধ্রুবা স্মৃতি লাভ হয়েছে। ইত্যাদি... এ বড় সহজ কর্ম নয়। ভ্রম উৎপন্নকারী ইন্দ্রিয় সকল বোধিরূপ রাশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে পারলে তবেই প্রাপ্ত হওয়া যায় সফলতা। মহাভারতের কবি আমাদের জানাচ্ছেন শত্রুজয়ী জিতনিদ্র অর্জুন, তিনিও কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে স্বীয় বিরোধী শিবিরে স্বজন, প্রিয়জন ও আচার্যগণকে উপনীত দেখে স্থিরচিত্ত থাকতে পারেননি। তিনি ক্ষত্রিয়বীর ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সমাজকে অনাচাররূপ ব্যাধি থেকে মুক্ত করা তাঁর কর্তব্য একথা বিস্মৃত হয়ে নিতান্ত সাধারণের মতো আবেগবিহ্বল ভাষায় বলে উঠলেন—

"গুরুনহত্বা হে মহানুভাবান শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষমপীহলোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরুনিহৈব ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধির প্রদিগ্ধান্।। ২/৫
'ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়োঞ্ড়; যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম
স্তেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ।। ২/৬

মহানুভব গুরুজনদিগকে বধ না করে ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভোজন করাও ভাল। গুরুজনদের বধ করে ইহলোকে যে অর্থ ও কাম ভোগ করব, তা তো হবে গুরুজনদের রুধিরলিপ্ত (৫)

যদি বা জয়ী হই, অথবা আমাদের যদি এঁরা জয় করেন এই দুটির মধ্যে যে কোনটি শ্রেষ্ঠ তা বুঝতে পারছি না। (৬)

আরও যা জানাতে চাইলেন তার মর্মার্থ— আমি তোমার শিষ্য তোমার শরণাগত, আমার পক্ষে যা শ্রেয় সেই বিষয়ে আমায় উপদেশ দাও।" শোক বিহ্বল অর্জুন এই বলে যুদ্ধ থেকে বিরত হতে চাইলেন।

শ্রীভগবান বললেন—

'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যাং তৎক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।। ২/৩

হে পার্থ, ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হয়ো না। এইরূপ কাতরতা তোমায় শোভা পায় না। হে পরন্তপ, হৃদয়ের ক্ষুদ্র দুর্বলতা পরিত্যাগ করে ওঠ।

পরবর্তী শ্লোকগুলিতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মনোবৈকল্য দূর করতে, তাঁকে পুনরায় যুদ্ধে প্ররোচিত করতে; আত্মার অবিনাশত্ব ও যোগস্থিতি সম্বন্ধে গীতার তত্ত্ব ব্যক্ত করলেন, দ্বিতীয় অধ্যায় (সাংখ্য যোগ), তৃতীয় অধ্যায় (কর্মযোগ) অতিক্রম করে চতুর্থ অধ্যায় (জ্ঞান যোগ)-এর শেষ ভাগে এসে ভগবান বললেন—

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞান সংচ্ছিন্নসংশয়রম্।
আত্মবস্তং ন কর্ম্মানি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।। ৪/৪১
তস্মাদজ্ঞানসম্ভুতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত।। ৪/৪২

হে অর্জুন পরমার্থ দর্শনরূপ যোগ দ্বারা যিনি সর্বকর্ম শ্রীভগবানে বা ব্রহ্মো অর্পন করেছেন, আত্মদর্শন রূপ জ্ঞানের দ্বারা যার সকল সংশয় ছিন্ন হয়েছে সেই প্রসাদশূন্য আত্মবিদ্ পুরুষকে কর্ম্ম সকল আবদ্ধ করতে পারে না। (৪১)

অতএব হে অর্জুন, তোমার হৃদয়ের অজ্ঞতাজাত এই সংশয়রাশি জ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা ছেদন করে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অবলম্বন কর এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। (৪২)

অর্থাৎ গীতা তথা ভারতবর্ষ মনে করে একজন রাজনৈতিক কর্মী বা একজন সমাজকর্মীকে হতে হবে সৎ, চরিত্রবান, স্থিতধী, ত্যাগী, বীতশোক, বিগতমোহ, তবেই তার দ্বারা সমাজের সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হওয়া সম্ভব।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দৃষ্টি দেওয়া যাক্ রবীন্দ্রনাথের এই গানখানিতে—

শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান,
সব দুর্বল সংশয় হোক অবসান।
চির শক্তির নির্ঝর নিত্য ঝরে
লহ সে অভিষেক ললাট পরে।
তব জাগ্রত নির্মল নূতন প্রাণ
ত্যাগ ব্রতে নিক দীক্ষা, বিঘ্ন হতে নিক শিক্ষা—
নিষ্ঠুর সঙ্কট দিক সম্মান।
দুঃখই হোক তব বিত্ত মহান।

গানটি স্বদেশ পর্যায়ের ৪০নং গান, রচিত হয়েছিল ১৯৩৭ খৃঃ কলিকাতা বিশ্বাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে। গানটির এই অংশের বানী বিন্যাস অনুসরণ করলে সহজেই উপলব্ধ হয় গীতার ভাবনার উদ্‌ভাসন।

আবার গীতার শ্লোকে মনোনিবেশ করা যাক। নবম অধ্যায়ের ১৮তম শ্লোকে শ্রীভগবান নিজ স্বরূপ প্রকাশ করছেন এই ভাবে—

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম।।

আমি সকলের গতি, পোষণকর্তা, প্রভু, শুভাশুভের দ্রষ্টা এবং স্থিতি স্থান, আমি সকলের রক্ষক ও জগতের বন্ধু। আমি স্রষ্টা, সংহার কর্তা, আধার ও লয়স্থান। আবার আমিই অবিনাশী বীজ-স্বরূপ।

গীতার আদর্শে দীক্ষিত কবি অবগত হয়েছেন ব্রহ্মাণ্ডের সকল কর্মকাণ্ডের কর্ণধারের স্বরূপ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রাক্কালে কবির প্রণামগাথা গীত হয় সেই 'কর্ণধারের' উদ্দেশ্যে—

আমাদের যাত্রা হলো শুরু এখন, ওগো কর্ণধার
তোমারে করি নমস্কার।
এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরব না গো আর—
তোমারে করি নমস্কার।।
আমরা দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি বিপদ বাধা নাহি গনি
ওগো কর্ণধার।
এখন মাভৈঃ বলি ভাসাই তরী, দাও গো করি পার—
তোমারে করি নমস্কার।।

তৃতীয় অধ্যায়ের ৩০ তম শ্লোকে প্রবক্তা বলেছেন—

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যাস্যাধ্যাত্ম চেতসা।
নিরাশীনির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগত জ্বরঃ।।

প্রকৃত বিবেক বুদ্ধি সহকারে সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করে ফলাভিসন্ধি রহিত হয়ে, মমত্বশূন্য হয়ে শোক ত্যাগ পূর্বক যুদ্ধ কর।

তাই কি গানের পরবর্তী অংশে সংগ্রাম-বিবেকীর ভাষায় নির্বিশেষে নিঃশঙ্কতার ভাবনা—

মোদের কেবা আপন, কেবা অপর কোথায় বাহির কোথা বা ঘর
ওগো কর্ণধার।
চেয়ে তোমার মুখে মনের সুখে নেব সকল ভার—
তোমারে করি নমস্কার।।
....
মোদের মরণ বাঁচন ঢেউয়ের নাচন, ভাবনা কী বা তার—
তোমারে করি নমস্কার।
....
আমরা সহায় খুঁজে পরের দ্বারে ফিরবো না আর বারে বারে
ওগো কর্ণধার।
কেবল তুমিই আছ আমরা আছি এই জেনেছি সার—
তোমারে করি নমস্কার।।

স্বদেশ পর্যায়ের ৩৫তম গানটিতেও রয়েছে গীতার অন্তর্ভাবনার প্রচ্ছায়া, যেখানে কবির প্রার্থনা—

এ ভারতে রাখো নিত্য, প্রভু তব শুভ আশীর্বাদ—
তোমার অভয়, তোমার অজিত অমৃত বাণী,
তোমার স্থির অমর আশা।।
অনির্বাণ ধর্ম আলো সবার ঊর্ধ্বে জ্বালো জ্বালো,
সঙ্কটে দুর্দিনে হে,
রাখো তারে অরণ্যে তোমারই পথে।।
বক্ষে বাঁধি দাও তার বর্ম তব নির্বিকার,
নিঃশঙ্কে যেন সঞ্চরে নির্ভীক।
পাপের নিরখি জয় নিষ্ঠা তবুও রয়—
থাকে তব চরণে অটল বিশ্বাসে।।

সামগ্রিক ভাবে গীতা ব্যক্তি মানবকে সর্বপ্রকার আবেগবিহ্বলতা, ক্লীবতা, সংশয়তা, তামসিকতা থেকে মুক্ত করে, তাকে স্থিতপ্রজ্ঞ, আত্মপ্রত্যয়ী, কর্তব্যমুখী উন্নততর মানুষে পরিণত হবার উৎসাহ দান করেন। এবং সেই প্রজ্ঞাবান মানুষকে সকাম কর্ম থেকে নিষ্কাম কর্মের দিকে, অর্থাৎ স্বার্থপরতা থেকে পরার্থপরতার দিকে আহবান জানান। কারণ ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে সমাজ, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের সম্পর্কে অবিচ্ছেদ্য, উভয়েই উভয়কে পরিপুষ্ট করে তোলে। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য 'শান্তিনিকেতন ভাষণ মালা'র সমগ্র এক প্রবন্ধে কবির অনুভবী বক্তব্য— ''সমাজ-সত্তার ভিতরে একটি শক্তি বর্তমান যা সমাজকে কেবলই বর্তমানে আবদ্ধ করছে না, তাকে তার ভাবী পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, সমাজস্থ প্রত্যেকের স্বার্থকে সকলের স্বার্থ এবং সকলের স্বার্থকে প্রত্যেকের স্বার্থ করে তুলছে।''

স্বদেশ পর্যায়ের ১১তম গানটিতে রয়েছে এই সামগ্রিক চেতনার প্রতিচ্ছবি।—

সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান,
সঙ্কটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ।
মুক্ত করো ভয় আপনা মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয়।

প্রথম স্তবকে রয়েছে ব্যক্তিমানসের উত্তরণের বাণী। পরবর্তী স্তবকে কবির চেতনা সমাজমুখী। বললেন—

দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।...
মুক্ত করো ভয়, নিজের পরে করিতে ভর না রেখো সংশয়।

অতঃপর আসে চরম আহ্বান—

ধর্ম যবে শঙ্খ রবে করিবে আহ্বান
নীরব হয়ে নম্র হয়ে, পণ করিয়ো প্রাণ।
মুক্ত করো ভয়, দুরূহ কাজে নিজেরই দিয়ো কঠিন পরিচয়।।

গানটি রচিত হয় ১৯৩১ খৃঃ কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে ও বিশ্বভারতীর প্রযোজনায় নবীন গীতিনাট্যের অভিনয় ও জাপানি যুযুৎসু প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়, সেই উপলক্ষ করে।

মানুষ কখনও ব্যক্তিজীবনে, কখনও সমাজজীবনে, কখনও রাজনীতির প্রাঙ্গণে রণক্লান্ত সৈনিক। অর্জুন এই সমস্যাসঙ্কুল মানবজীবনেরই প্রতিভু। শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় সখা ফাল্গুনীকে সঙ্কটমুক্ত, নৈরাশ্যমুক্ত হবার পথ নির্দেশ করেছেন আত্ম-উদ্বোধক উপদেশের দ্বারা। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের কিছু গানে আছে এমনই আত্ম-উদ্দীপনের ভাষা যার জোরে ধর্ম ও নীতিবোধ সহায় করে মানুষ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ :

(১) আমি ভয় করব না ভয় করবো না।
দু' বেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না—
....
ধর্ম আমার মাথার রেখে চলব সিধে রাস্তা দেখে
বিপদ যদি এসে পড়ে সরব না, ঘরের কোণে সরব না।
(২) নাই নাই ভয় হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার—
জানি জানি তোর বন্ধনডোর ছিঁড়ে যাবে বারে বার।।
খনে খনে তুই হারায়ে আপনা সুপ্তিনিশীথ করিস যাপনা—
বারে বারে তোরে ফিরে পেতে হবে বিশ্বের অধিকার।।
(৩) আপনি অবশ হলি, তবে বল দিবি তুই কারে?
উঠে দাঁড়া, উঠে দাঁড়া, ভেঙে পড়িস না রে।।
করিস নে লাজ, করিস নে ভয়, আপনাকে তুই করে নে জয়—
সবাই তখন সাড়া দেবে ডাক দিবি, তুই যারে
....
নেই যে রে ভয় ত্রিভুবনে, ভয় শুধু তোর নিজের মনে—
অভয়চরণ শরণ করে বাহির হয়ে যারে।।

ধর্মযুদ্ধের যে বিশেষ প্রকৃতি আছে, তার সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে 'গীতার' কয়েকটি শ্লোকে। যেমন দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩২তম শ্লোকে শ্রীভগবান বলছেন—

''যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্
'অপার্থিতভাবে প্রাপ্ত এই যুদ্ধ মুক্ত স্বর্গ দ্বার স্বরূপ'।

৩৩তম শ্লোকে বলছেন—

''অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম কীর্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি।।'' (৩৬)

অতঃপর যদি এই যুদ্ধে তুমি অংশ না নাও তবে স্বধর্ম ও কীর্তি হারিয়ে তুমি পাপভাগী হবে।

৩৭ ও ৩৮ তম শ্লোকে কী বললেন?

“হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।। (৩৭)
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি। (৩৮)

হে কৌন্তেয়, যুদ্ধে নিহত হলে তোমার স্বর্গলাভ, আর জয়ী হলে রাজ্যলাভ। অতএব যুদ্ধের জন্য কৃতসংকল্প হও। এবং সুখ-দুঃখ লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয় এসব সমান জ্ঞান করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। এতে তোমাকে পাপ স্পর্শ করবে না।

অতএব দেখা যাচ্ছে ধর্মযুদ্ধে বা জীবনের সঙ্কটকালে ফলাফল উপেক্ষা করে, ন্যায়ের পক্ষে অংশগ্রহণ করাই শ্রেয়।

ধর্মযুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে গীতা প্রণেতা এক তাৎপর্যপূর্ণ বাণী শোনালেন—

“যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীবিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম।।” ১৮/৭৮

কবিরও স্থির বিশ্বাস যুদ্ধে ন্যায়ের পক্ষেই সারথ্য করেন বিশ্বের সর্বোত্তম ন্যায়ধীশ। তাই কুরুক্ষেত্রে ধার্মিক পাণ্ডব-পক্ষই যেমন জয়প্রাপ্ত হয়েছিল, তেমনই ঔপনিবেশিক বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয়দের জয়ও সুনিশ্চিত। কবির বিশ্বাসের এই দৃঢ়তাই প্রসারিত রয়েছে নিম্নলিখিত স্বদেশ পর্যায়ের গানগুলিতে—

“রইল বলে রাখলে কারে, হুকুম তোমার ফলবে কবে?
তোমার টানাটানি টিকবে না ভাই, রবার যেটা সেটাই রবে।।
যা খুশি তাই করতে পারো গায়ের জোরে রাখো মারো।।”

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হবে?—

“যাঁর গায়ে সব ব্যথা বাজে তিনি যা সন সেটাই সবে।।”
অনেক তোমার টাকা করি, অনেক দড়া অনেক দড়ি,
অনেক অশ্ব অনেক করী, অনেক তোমার আছে ভবে।
ভাবছ হবে তুমিই যা চাও, জগৎটাকে তুমিই নাচাও
দেখবে হঠাৎ নয়ন খুলে হয় না যেটা সেটাও হবে।”

জয়ের প্রত্যয়ে স্থির কবির মুক্ত কণ্ঠের ঘোষণা—

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে,
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
....
তোরা ভরসা না ছাড়িস কভু, জেগে আছেন জগৎ প্রভু
ওরা ধর্ম যতই দলবে ততই ধুলায় ধ্বজা লুটবে
ওদের ধুলায় ধ্বজা লুটবে।

কবির প্রশ্নবোধক সংশয় এই গানটিতে—

বিধির বিধান কাটবে তুমি এমন শক্তিমান
তুমি কি এমনি শক্তিমান!
আমাদের ভাঙ্গাগড়া তোমার হাতে এমন অভিমান
তোমাদের এমনি অভিমান।।
....
শাসনে যতই ঘেরো আছে বল দুর্বলেরও
হও-না যতই বড়ো আছেন ভগবান।
আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে রে,
বোঝা তোর ভারী হলেই ডুববে তরীখান।।

গীতার একটি বিশেষ বিষয় হলো আত্মার অবিনশ্বরতার তত্ত্ব। দ্বিতীয় অধ্যায়ে গীতা বলছেন—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।। ২/২০
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।। ২/২২
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।। ২/২৩

আত্মা জন্ম ও মৃত্যু রহিত, বিনাশরহিত শাশ্বত। শরীর হত হলেও তিনি হত হন না। কেবলমাত্র জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগের মতো আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করে নূতন শরীর আশ্রয় করেন।

কোনও শাস্ত্র আত্মাকে ছেদন করতে পারে না, অগ্নি একে দহন করতে পারে না, জল একে সিক্ত করতে পারে না।

এই অপরোক্ষ আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অধিকারী, স্থির, অচল, সনাতন। সুতরাং মৃত্যুর জন্য শোক পরিত্যাগ করা উচিত। জীবগণের শরীর উৎপত্তির পূর্বে অপ্রকাশিত, স্থিতিকালে মাত্র প্রকাশিত এবং বিনাশের পরেও অপ্রকাশিত থাকে। অতএব তাহাতে শোক করা অনুচিত?

স্বদেশ পর্যায়ের কিছু সঙ্গীতাংশের বাণী নির্মিতির ভিত্তি আত্মার অবিনশ্বরতার প্রতি আস্থা। এই পর্যায়ের ৩৯তম গানটির তৃতীয় স্তবক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

দূর করো সংশয় শঙ্কার ভার,
যাও চলি তিমিরদিগন্তের পার।
....
হও মৃত্যুতোরণ উত্তীর্ণ,
যাক, যাক ভেঙে যাক যাহা জীর্ণ।
চলো অভয় অমৃতলোকে, অজর অশোকে,
বলো জয় বলো, জয় বলো, জয়—
অমৃতের জয় বলো ভাই।।

৪০তম গানটির শেষ ছটি পংক্তি উল্লেখের প্রয়োজন—

চল, যাত্রী, চল, দিনরাত্রি—
কর, অমৃত লোকপথ অনুসন্ধান।
জড়তা তামস হও উত্তীর্ণ,
ক্লান্তি জাল কার, দীর্ণ বিদীর্ণ—
দিন-অন্তে অপরাজিত চিত্তে
মৃত্যুতরণ তীর্থে কর স্নান।।

যিনি আত্মার স্বরূপ অবগত তাঁর ‘মৃত্যুতোরণ’ পার হতে ভয় কি? দেহরূপ জীর্ণ খাঁচাখানি ভেঙে গেলে এই প্রাণপাখি (জীবাত্মা), পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হবে। মিলিত হবে অজর (সদা চৈতন্যময়), অমৃতময় (মৃত্যুহীন) লোকে। তাই ৩৯তম গানটির শেষে কবি বলেছেন “অমৃতের জয় বলো ভাই।”

‘শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা’— এই পুস্তিকার উল্লেখ মাত্রই আমাদের চিত্তপটে

ভেসে ওঠে একটি চিত্র— রথারূঢ় অর্জুন এবং সারথি রূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। স্বদেশ পর্যায়ের দুটি গানে যে চিত্রকল্পের সন্ধান পাওয়া যায় তার সঙ্গে এই চিত্রের নিকট সাযুজ্য আছে। ১৬তম গান 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী'। এই গানটির ৪র্থ স্তবকটি লক্ষ্য করা যাক—

জনগণপথ তব জয়রথ চক্রমুখর সাজি,
স্পন্দিত করি দিগ্‌দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?...

ভারত অভিধায় অর্জুনের উল্লেখ তাৎপর্যপূর্ণ। ৫ম স্তবকটিতে এসে বিশেষ ভাবেই মনে হয় এটি যেন গীতার দার্শনিক চেতনার রাবীন্দ্রিক ভাষ্য—

যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তরমাঝে
বর্জিল ভর, অর্জিল জয়, সার্থক হল কাজে।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
আত্ম-অবিশ্বাস তার নাশ' কঠিন ঘাতে,
পুঞ্জিত অবসাদভার হান' অশনিপাতে।
ছায়াভয় চরিতমূঢ় কর পরিত্রাণ হে, জাগ্রত ভগবান হে।।

গীতার 'শ্রীভগবান' কবির লেখনীতে—'জাগ্রত ভগবান'।

অপর গানটি আমাদের অতি পরিচিত জাতীয় সঙ্গীতে। এই গানটির তৃতীয় স্তবকের বাণীব্যঞ্জনার মধ্যে লুকিয়ে আছে সেই মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের একখানি ছবি, যেটি আমরা 'গীতা' গ্রন্থের প্রচ্ছদ পটে সর্বদাই দেখতে পাই। গানের বাণীটি নিম্নরূপ :

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ-যুগ ধাবিত যাত্রী
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব-মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সঙ্কট দুঃখ ত্রাতা।
জনগণপথপরিচায়ক জয় হে ভারতভাগ্য বিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।।

এই রথ মহাকালের পথে ধর্মের রথ, তার সারথি কে? স্বয়ং সঙ্কটদুঃখত্রাতা, জনগণ পথপরিচায়ক, ভারত ভাগ্যবিধাতা। আর আমরা হলাম সেই যাত্রী সাধারণ যারা যুগ যুগ ধরে পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর মহাকালের পথ ধরে চলেছি আমাদেরই ভাগ্যবিধাতার সারথ্যে।

গীতা বিভেদকামী নয়, মিলন প্রয়াসী, সকল ধর্মের, সকল সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর মানুষের আধ্যাত্মিক চারিত্রিক উন্নতির সহায়তা বিধান করাই গীতার লক্ষ্য।

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রী ভগবান উদার ভাবে ঘোষণা করছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।। ৪/১১

যিনি যে প্রকারে আমার উপাসনা করেন আমি তাঁকে সেই ভাবেই অনুগৃহীত করি। ইত্যাদি—

নবম অধ্যায়ে গীতার বাণী আরও ব্যাপ্ত।
যেহপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্।। ৯/২৩

যাঁরা শ্রদ্ধাসহকারে অন্য দেবতার আরাধনা করেন, হে কৌন্তেয়, সেই সকল ভক্তও অজ্ঞান পূর্বক (নিজ অজান্তে) আমারই উপাসনা করেন।

এমন কি ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হয়ে, নিষ্কাম হয়ে কর্ম করলে সেই কর্মযোগীও ব্রহ্মপদ লাভে সমর্থ; গীতা এমনই অভিমত পোষণ করেন।

অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব, রুচি, ধর্মবিশ্বাস ভেদে গীতা সব মানুষকেই একটি ধ্রুব সত্যের ছায়ায় লালিত করতে চায়। গীতা বিশ্বমানবিকতার আদর্শে বিশ্বাসী। গীতা উপনিষদের সারাৎসার, ভারতের আত্মা স্বরূপ। গীতার বাণী, মহান ভারতবর্ষের শাশ্বত মর্মবাণী।

এই বক্তব্যের সমর্থন পাই রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' ভাষণমালার অন্তর্গত 'তপোবন' প্রবন্ধে। তিনি লিখছেন—

...যে সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিত ভাবে লাভ করতে পারে সে সত্যটি কী। সে সত্য প্রধানত বণিকবৃত্তি নয়, স্বরাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়; সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা। সেই সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে, বুদ্ধদেব সেই সত্যকে পৃথিবীতে সর্বমানবের নিত্যব্যবহারে সফল করে তোলবার জন্যে তপস্যা করেছেন এবং কালক্রমে নানাবিধ দুর্গতি ও বিকৃতির মধ্যেও কবীর, নানক প্রভৃতি ভারতবর্ষের পরবর্তী মহাপুরুষগণ সেই সত্যকেই প্রচার করে গেছেন। ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা। ...সেই তপস্যা আজ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে— দাস ভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্ত্বিকভাবে সাধকভাবে। যতদিন তা না ঘটবে ততদিন আমাদের দুঃখ পেতে হবে, অপমান সইতে হবে; ততদিন নানা দিক থেকে আমাদের বারম্বার ব্যর্থ হতে হবে। ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মজ্ঞান, সর্বজীবে দয়া, সর্বভূতে আত্মোপলব্ধি, একদিন এই ভারতে কেবল কাব্যকথা, কেবল মতবাদরূপে ছিল না; প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে একে সত্য করে তোলবার জন্য অনুশাসন ছিল। সেই অনুশাসনকে আজ যদি আমরা বিস্মৃত না হই, আমাদের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষাকে সেই অনুশাসনের যদি অনুগত করি, তবেই আমাদের আত্মা বিরাটের মধ্যে আপনার স্বাধীনতা লাভ করবে এবং কোনও সাময়িক বাহ্য অবস্থা আমাদের সেই স্বাধীনতাকে বিলুপ্ত করতে পারবে না।'

এই আলোতেই রবীন্দ্রনাথ আঁকতে চেয়েছেন ভারতের মুক্তি আন্দোলনের তথা মানবমুক্তির রূপরেখা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনোত্তর কালে কবির স্বদেশ প্রীতির সঙ্গে ধীরে ধীরে অন্বিত হয়েছে কবির বিশ্বমানবপ্রীতি। দেশ মাতৃকার চরণে মাথা রেখে কবি অনুভব করেছেন 'বিশ্বময়ীর' 'বিশ্বমায়ের' আঁচলের স্নেহচ্ছায়া। ভারততীর্থের পুণ্য পাদপীঠ থেকে কবিকণ্ঠে উদ্‌গীত হলো বিশ্বমানবতার গান—

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে
উদার ছন্দে, পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।

গ্রন্থঋণ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্ররচনাবলী জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ ৭ম খণ্ড পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তদেব, ৯ম খণ্ড পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তদেব, শান্তিনিকেতন ১ম খণ্ড বিশ্বভারতী। রমেশচন্দ্র দত্ত 'হিন্দুশাস্ত্র' ২য় অখণ্ড সং নিউ লাইট। ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী গীতাধ্যান ৫ম সমগ্র সংস্করণ মহানামব্রত কালচারাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট। ডঃ অরুণ কুমার বসু বাংলা কাব্যসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত দে'জ পাবলিশিং। নৃপেন্দ্রলাল দাশ গীতা ও সপ্তম বেদাঙ্গ গীতাপাঠ।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষাক্রম Module সাম্মানিক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর। ❑

চিঠিপত্র

শ্যামাপ্রসাদ এবং গোলওয়ালকর

শ্রীউদয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় (আঃ বাঃ পঃ ২৭ জুন ২০১২) লিখেছেন যে জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার সময়ে শ্যামাপ্রসাদ গোলওয়ালকরের সার্বিক সমর্থন পাননি। তথাপি আর এস এস প্রচারকদের তিনি (গোলওয়ালকর) জনসঙ্ঘ গঠনে অনুমতি দেন। অর্থাৎ তিনি সমর্থনও করেননি, বিরোধিতাও করেননি।

কিন্তু শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য মোটেই

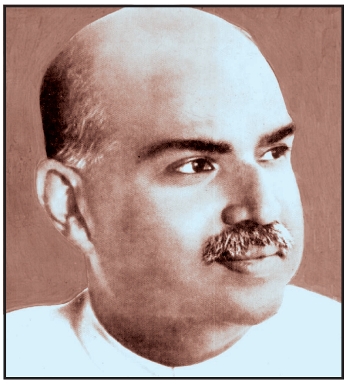

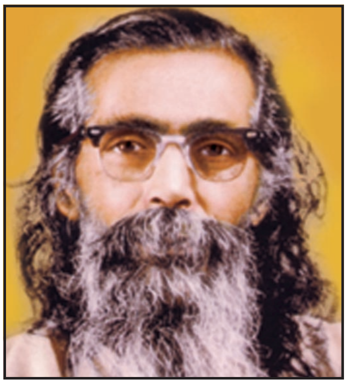

সঠিক নয়। প্রকৃত তথ্য হলো গোলওয়ালকার নিজেই উদ্যোগী হয়ে কয়েকজন সুদক্ষ প্রচারককে বেছে নেন এবং তাঁদেরকে জনসঙ্ঘের কাজের জন্য পাঠান। আমার বক্তব্যের সমর্থনে আমি অর্গানাইজার পত্রিকার ২৫ জুন ১৯৫৬-তে প্রকাশিত গোলওয়ালকরের সেই লেখাটিরই কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি যে লেখাটির কিয়দংশ শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখায় উদ্ধৃত করেছেন। উদ্ধৃতিটি এইরূপ—

"...সঙ্ঘ কখনই কোনও রাজনৈতিক বা অন্য দলের তল্পিবাহক হবে না। রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের কাজে নিয়োজিত কোনও সংগঠন শুধু তখনই সাফল্য লাভ করতে পারে যতক্ষণ এই সংগঠন কোনও রাজনৈতিক দলের দাস হয়ে কাজ না করবে। এই ভূমিকা তিনি (শ্যামাপ্রসাদ) সঠিক বলেই মনে করেন এবং সে বিষয়ে তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন করেন। সেই সঙ্গে তিনি এ কথাও পরিস্কার জানিয়ে দেন যে নূতন দলেরও তার বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে যে, সে কোনও দলের গোলাম হয়ে থাকবে না।

নূতন দলের আদর্শ হিন্দুরাষ্ট্র :

এই মূলগত নীতিগুলির ভিত্তিতে সঙ্ঘ ও নূতন দলের সম্পর্ক স্থির হবার পর এ বিষয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন ছিল যে প্রস্তাবিত দলের নিষ্ঠা কোন্ কোন্ আদর্শের প্রতি হবে। সঙ্ঘের নিজের এক নিশ্চিত লক্ষ্য ও কার্যপদ্ধতি আছে, অতএব এই সংগঠনের কোনও স্বয়ংসেবকের সহযোগিতা পেতে হলে সেটা তখনই পাওয়া যাবে যখন দেখা যাবে যে আদর্শবাদের ভিত্তিতে দলের স্বতন্ত্র একটি রাজনৈতিক ভাবমূর্তি আছে। এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর প্রদত্ত একটি বিবৃতির প্রতি আমি (গোলওয়ালকর) তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি যাতে তিনি বলেছিলেন যে হিন্দু রাষ্ট্রের প্রতি নিষ্ঠা রাখার কারণে হিন্দু মহাসভা সাম্প্রদায়িক। আমি বললাম, সঙ্ঘও হিন্দু মহাসভার চেয়ে বেশি না হলেও তার মতোই একথা বিশ্বাস করে যে ভারতীয় রাষ্ট্র হিন্দু রাষ্ট্র, তাহলে কি সঙ্ঘকেও তিনি দূরে রাখতে চান? তাহলে তার পরিণাম হবে এই যে তিনি আমার কোনও সহানভূতির আশা করতে পারবেন না এবং আমার সহকর্মীদের সহযোগিতারও আশা করতে পারবেন না, কারণ তাঁরাও হিন্দু রাষ্ট্রের উপর দৃঢ় আস্থা রাখেন এবং তার জন্যই অক্লান্ত ভাবে কাজ করেন। তিনি স্বীকার করেন তিনি অনবধানতা বশতঃ ওই মন্তব্য করেছিলেন। হিন্দু-রাষ্ট্রের আদর্শের প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ সহমত জ্ঞাপন করে তিনি বলেন যে আমাদের সংবিধানের ভারতীয় রাষ্ট্রীয়তার যথাযথ বর্ণনা ও প্রতিপাদন করা হয়নি। তিনি একথাও স্বীকার করেন যে হিন্দু-রাষ্ট্রকে তার অতীত গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজ্যের পরিকল্পনার বিরোধী নয়, কারণ হিন্দু রাষ্ট্র দেশের সকল ব্যক্তিকে পূর্ণ নাগরিক স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক, ধার্মিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠার সমান আশ্বাস প্রদান করে। এই আশ্বাস অহিন্দু সম্প্রদায়গুলিকেও দেওয়া হয় এই শর্তে যে তারা রাষ্ট্রদ্রোহী কাজ করবে না এবং রাষ্ট্রকে তার সর্বোচ্চ গৌরবের অধিষ্ঠান থেকে ষড়যন্ত্র করে সরাবার এবং শাসন ক্ষমতা দখল করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে না। তিনি তাঁর নূতন রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য ও নীতিগুলির মধ্যে উক্ত তথ্যগুলিকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার তীব্র ইচ্ছাও প্রকাশ করেন। এই রকম ঐক্যমত্যে উপনীত হওয়ার পর আমি আমাদের কয়েকজন নিষ্ঠাবান সহকর্মীকে বেছে নিই যাঁরা নিঃস্বার্থ ও দৃঢ়-সংকল্পের মানুষ ছিলেন এবং নূতন দলের স্থাপনার ভার নিজেদের কাঁধে তুলে নেবার সামর্থ্য রাখতেন। ওই নূতন রাজনৈতিক দলকে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়ে দেওয়ার যোগ্যতা তাঁদের মধ্যে ছিল। এই রূপে ডঃ মুখার্জী ভারতীয় জনসঙ্ঘের স্থাপনার মাধ্যমে তাঁর আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করতে পেরেছিলেন।

সঙ্ঘ-জনসঙ্ঘ সম্পর্ক :

উৎকৃষ্ট কার্যকর্তাদের একটি দলকে ডঃ মুখার্জীর হাতে সঁপে দেওয়ার পর আমার নিজস্ব নিষ্ঠা অনুসারে আমি নিজেকে জনসঙ্ঘের পরবর্তী গতিবিধি থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে রাখলাম এবং সঙ্ঘের সঙ্গে আমাদের হিন্দুদের সংগঠিত করার সাংস্কৃতিক দৈনন্দিন কাজের প্রতি মনোনিবেশ করলাম। তথাপি, মাঝে-মধ্যে যখনই আমাদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হোত, তখনই তিনি জনসঙ্ঘের অগ্রগতি এবং আগামী কর্মসূচী অথবা আন্দোলন সংক্রান্ত সংবাদ আমাকে জানাতেন। আমিও সঙ্ঘকার্যে তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণ করতাম।..."

(সূত্র : শ্যামাপ্রসাদ জন্ম শতবর্ষে, সম্পাদনা : অধ্যাপক নিখিলেশ গুহ, পৃ:-২০৭-২০৮)

—**প্রদীপ ঘোষ, বালী, হাওড়া।**

মুসলমান সমাজ কানে তুলো গুঁজে রাখুক এটাই চায় মোদী-বিরোধীরা

শ্যামল কুমার হাতি

আমাদের অনেকেরই অভ্যাস আছে সবাই যে কথা বলছে তাকে মেনে নেওয়া। যুক্তি তখন আমরা দিই— সবাই যখন বলছে তাহলে ঠিক। এই 'আমরা'ই হলাম সংখ্যায় বেশী। আজ অধিকাংশ লোকেদের কথা ভাবা অথবা বিশ্বাস করা সেই 'আমাদের' কাছে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ভারত ভাগ হয়েছিল। তখন যে সমস্ত মুসলমান এদেশকে ভালবেসে এবং এদেশের সুখেই সুখ এবং কষ্টে কষ্ট অনুভব করতেন তাঁরা ভারত মায়ের সন্তান ছিলেন। তখন তাঁরা দেশকেই সামনে রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কারও বিরোধ ছিল না। তারা মিলেমিশে থাকতেই পছন্দ করতেন। সেইজন্য পঞ্চাশের দশকে সোমনাথের মন্দির পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল। মুসলিম শাসনকালে যে শিবের মন্দিরকে মসজিদে পরিণত করা হয়েছিল তাকেই পঞ্চাশের দশকে মন্দির বানিয়েছিল সোমনাথ ট্রাস্ট। গান্ধীজীর পরামর্শে বল্লভভাই-এর তত্ত্বাবধানে ওই সোমনাথ ট্রাস্ট গঠিত হয়েছিল। আমাদের প্রথম রাষ্ট্রপতি সেই মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। সারা ভারতে কোথাও কোনও গণ্ডগোল হয়নি। কোনও প্রতিবাদ, প্রতিরোধ বা বনধ্ হয়নি। এই সত্যটা আজ অনেকেই ভুলে গেছেন। ১৯৯২ সালে অযোধ্যায় রামজন্মভূমি আন্দোলনে ওখানকার 'বিতর্কিত ধাঁচা'টা ভাঙার পর সারা ভারতে ভীষণ গণ্ডগোল, হইচই পড়ে গিয়েছিল। পশ্চিমবাংলার প্রয়াত বৃদ্ধ মুখ্যমন্ত্রী 'বিতর্কিত ধাঁচা' ভাঁঙার জন্য ভীষণ নিন্দা করেছিলেন। কারও মনে কি প্রশ্ন জাগেনি সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণ-এর সময় এই বয়োবৃদ্ধ মুখ্যমন্ত্রী কেন কোনও প্রতিবাদ করেননি? তখন তো তিনি যুবপুরুষ ছিলেন। তাহলে তখন কেন চুপ ছিলেন? আসলে তখন মুঘল, রুসি কিন্তু পাঠান, দাউদ, বউবাজারের রসিদ খানেরা জন্মায়নি। তাই তিনি সোমনাথের সময় চুপচাপ ছিলেন। কিন্তু ১৯৯২-এ বৃদ্ধ বয়সেও আস্ফালন করেছিলেন।

প্রশ্ন হলো, কেন সবাই আজ মুসলমানদের খুশী করার প্রতিযোগিতায় নেমেছেন? ভোট পাওয়ার লোভ তো আছেই। একবারও কি কেউ ভাববেন না যে মানসিকতা নিয়ে মুসলমানরা একসময় এদেশে রইল তা থেকে কেন তারা সরে এল? কে দায়ী তার জন্য? কারাই বা দীর্ঘদিন কেন্দ্র ও রাজ্যে সরকারে ছিল? আজও কেন মুসলিমদের ভিতর এত অপরাধ প্রবণতা?

গুজরাটে ২০০২-এ গোধরায় ট্রেনের মধ্যে অযোধ্যা ফেরত করসেবকদের পুড়িয়ে মারার পরবর্তী দাঙ্গার জন্য ওখানকার মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দায়ী করে সারা ভারতে প্রচার সব দলই চালায়। সেই প্রচার আজও চলছে। গুজরাটে দাঙ্গার সময় একজন প্রাক্তন কংগ্রেসী এমপি-কে পুড়িয়ে মারা হয়। এটা খুবই দুঃখজনক এবং বাজে ঘটনা। ওই এমপি-র স্ত্রী এবং একজন সমাজকর্মী তিস্তা শীতলাবাদ তার জন্য আদালতেও যায়। সুপ্রিমকোর্ট স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম বা সিট গঠন করে। তার রিপোর্টে জানা যায় ওই প্রাক্তন এম পি তার বাড়ির সামনে জমায়েতের উপর বাড়ির মধ্য থেকে গুলি চালায়। তাতেই দু'জন ব্যক্তির মৃত্যু হয়। এরপর জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে ওই নারকীয় কাণ্ড ঘটায়। কংগ্রেস, সিপিএম, সমাজবাদী পার্টি, টি এম সি সমেত সবাই গুলি চালানোর ঘটনাটা মাঝখান থেকে গুলি মেরেছেন। মোদী ভিলেন হলেন। ১৯৮৪ সালে কলকাতায় বিটি রোডে এক শিখ ভদ্রলোক বাড়ির সামনে জমায়েতে জনতার উপর ঘর থেকে গুলি চালালে উন্মত্ত জনতা তাকেও পুড়িয়ে মারে।

কই তার জন্য তো কেউ তিস্তা শীতলাবাদ জ্যোতি বসুকে ভিলেন বানাননি? বাংলায় এক নিয়ম, গুজরাটে অন্য নিয়ম কেন?

সম্প্রতি নরেন্দ্র মোদী সমাজবাদী পার্টির প্রাক্তন এম পি সৈয়দ সিদ্দিকি সম্পাদিত 'নই দুনিয়া' উর্দু পত্রিকায় একটি সাক্ষাৎকার দেন। সৈয়দ সিদ্দিকি মহাশয় ওই সাক্ষাৎকারটি নেন। তিনি নরেন্দ্র মোদী-কে প্রশ্ন করেন, 'শিখ দাঙ্গার পর রাজীব গান্ধী, সোনিয়া গান্ধী এবং মনমোহন সিং শিখ সমাজের কাছে যদি ক্ষমা চাইতে পারেন, তাহলে আপনি ২০০২-এর দাঙ্গার জন্য কেন ক্ষমা চাইবেন না। নরেন্দ্র মোদী স্পষ্ট জবাব দেন, 'দাঙ্গার জন্য যদি আমি দোষী হই তাহলে আমায় ফাঁসি দেওয়া হোক। এবং এমনভাবে ফাঁসি দেওয়া হোক যাতে আগামী ১০০ বছরে আর কেউ দাঙ্গা করতে সাহস না দেখায়। আর ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আমায় ক্ষমা করার প্রয়োজন নেই।' এই কথাগুলোই সিদ্দিকি সাহেব হুবহু ছেপে দেন। ব্যাস সবাই রে রে করে উঠেছে। মুলায়ম তো 'সিদ্দিকি আর আমাদের দলের লোক নন' একথাও বলেছেন। আচ্ছা এতে ওদের রাগ হওয়ার কি আছে? আসলে মুসলমানেরা সত্যটা জেনে যাবেন। আর মোদীর নাম ভাঁড়িয়ে রাজনীতি করা যাবে না। এইসব ভয়েই সবাই আতঙ্কিত।

ছোটবেলায় একটা গল্প শুনেছিলাম সেটা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। একবার একদল ডাকাত মন্দিরে ডাকাতি করতে যাবে। তখন মন্দিরে প্রবচন হচ্ছে। সর্দার সবাইকে কানে তুলে গুঁজে ডাকাতি করতে যেতে বলে। ডাকাতি করার সময় এক ডাকাতের কানের তুলো খুলে মাটিতে পড়ে যায়। ডাকাতটি তা সঙ্গে সঙ্গেই তুলে নিয়ে কানে গুঁজে দেয়। এরপর ডাকাতি করে ফেরার সময় সর্দারের সামনে মা কালী দেখা দেন। তিনি সব গহনা রেখে দিতে বললে সর্দার তাড়াতাড়ি তা রেখে দেয়। কিন্তু এক ডাকাত ওই মা কালীকে জাপটে ধরে। তখনই মা কালী বলে 'আমায় ছেড়ে দাও, তোমরা গহনা নিয়ে যাও। আমি আর এমন করব না।' আসলে সে একটা বহুরূপী ছিল। মা কালী সেজে সে ডাকাতের মাল হাতড়ে নেওয়ার তালে ছিল। এরপর ডাকাত সর্দার ওই ডাকাতকে প্রশ্ন করে 'আচ্ছা ভাই আমরা যখন সবাই বোকা বনে গেলাম তখন তুমি কি করে বুঝলে যে ও মা কালী নয়?' ডাকাতটি উত্তর দিল— 'সর্দার আমার কানের তুলো খুলে গেলে তা মাটি থেকে কুড়িয়ে ফের কানে গোঁজার ফাঁকে আমার কানে মন্দিরের প্রবচনের একটা বাক্য ঢুকে গিয়েছিল, তা হলো ভগবানের ছায়া পড়ে না। তাই ওই কালীর ছায়া দেখে আমার সন্দেহ হয়। আমি ওকে ধরে ফেলি।' গল্পটা এখানেই শেষ। কিন্তু ডাকাত দলের সর্দাররা আজও আছে। ওরাই মুলায়ম, মায়াবতী, সোনিয়া, মমতা, কারাট আরও অনেকে। ওরা চায় মুসলিম সমাজ কানে তুলো গুঁজেই থাকুক। ওরা সত্য জানলে বিপদ। নরেন্দ্র মোদী ওদের কানের তুলো খোলার কাজ করছে বলেই এখন এত রাগ ওদের। ☐

লৌকিক দেবতা

ক্ষেত্রপাল

নবকুমার ভট্টাচার্য

উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার সোদপুর থানার অন্তর্গত খড়দা। বহু বছর পূর্বে এই স্থানটিকে গ্রামবাংলার পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। যদিও আজকের খড়দার সঙ্গে সেদিনের খড়দার মিল নেই। আজকের খড়দায় পট পরিবর্তনের পালা চলছে। এই খড়দায় লৌকিক এক দেবতার মূর্তি বহু প্রাচীনকাল থেকেই রয়েছে। এই দেবতা ক্ষেত্রপাল। কেউ কেউ বলছেন লৌকিক দেবতা ক্ষেত্রপালের সঙ্গে শিবের সংমিশ্রণ ঘটেছে। এই মন্দিরের শিবলিঙ্গকে রূপোর পাত দিয়ে যুক্ত করা হয়েছে। এই লিঙ্গের উর্ধ্ব অংশ স্বাভাবিক অপেক্ষা কিছু দীর্ঘ। উর্ধ্বভাগের কিছু অংশ খোলা যায়। যে অংশটি খোলা যায় সেই অংশটি নাকি ক্ষেত্রপালের প্রতীক। শোনা যায় এই দেবতার সেবাইতদের কোনও এক পূর্বপুরুষ নাকি সন্ন্যাস ধর্মগ্রহণ করে তীর্থভ্রমণে যান। সেই সময় পথে ওই ক্ষেত্রপালের প্রতীকটি প্রাপ্ত হন। পরে বাড়ি ফিরে তিনি ওই প্রতীকটি শিবলিঙ্গের উর্ধ্ব অংশে যোগ করেন। ফলে দুই দেবতার মিলন। তবে দুই দেবতার এইরকম মিশ্রণ খুব কমই মিলবে। শিবরাত্রির দিনে ঘটা করে বিশেষ শিব পুজো হয়। আবার দুর্গাপুজোর সময় ক্ষেত্রপালের অংশটি খুলে অন্যস্থানে রাখা হয়। বিজয়ার পরে আবার পূর্বমতো জোড়া দেওয়া হয়। পুরোহিতদের ধারণা, ক্ষেত্রপাল ও শিবের মূর্তি আলাদা। তাই সময় বিশেষে একে আলাদা করা হয়।

ক্ষেত্রপালের পুজোয় আমিষ, নিরামিষ প্রভৃতি দেওয়ার রীতি রয়েছে। নৈবেদ্যের বৈশিষ্ট্য পায়েস ও ছাতু। তাছাড়া দুধ, আতপ চাউল ও অন্যান্য তরিতরকারি দেওয়া হয়। ক্ষেত্রপালের অপর এক মূর্তি রয়েছে হাওড়া জেলার আলমপুরের কাছে মাশিলা গ্রামে। তবে এই মূর্তি সম্পূর্ণ শিবের প্রতীক। ক্ষেত থেকে এই মূর্তি পাওয়া বলে বাবার নাম ক্ষেত্রপাল। পূর্বে একটি গাছের নিচে ক্ষেত্রপালের অধিষ্ঠান ছিল। বর্তমানে মন্দির স্থাপন হয়েছে। সারা বছরই ভক্তের সমাগম। জাতপাত বর্ণ বিশেষ সকলেই এই দেবতার পুজো করতে পারেন। শ্রাবণ মাসে ভক্তের সমাগম বেশি মাত্রায় হলেও ক্ষেত্রপালের মূল উৎসব কিন্তু চৈত্রমাসে। ভক্তেরা তখন কৃপা ভিক্ষা করেন। চৈত্রমাসেই ক্ষেত্রপালের আবির্ভাব উপলক্ষে বিশেষ পুজো হয়। যারা জেলা থেকে এবং দূর দূরান্তরের জেলা থেকেও কয়েক হাজার ভক্ত উপস্থিত নন। তিন দিনের মেলাও বসে। ভক্তেরা প্রসাদ গ্রহণ করেন। ক্ষেত্রপালের কৃপা পাননি এমন ভক্তের সংখ্যা নগণ্য।

হাওড়া জেলার পাঁচলা থানার বিমল দাস ক্ষেত্রপালের একজন ভক্ত। তার কাছ থেকেই জানা গেল ক্ষেত্রপালের অলৌকিক নানা মহিমার কথা। ক্ষেত্রপালের আরাধনা করে কঠিন রোগে আক্রান্ত বহু মানুষই নীরোগ হয়েছেন। নিত্য দেবতার পুজো হয়। ভক্তেরাও পুজো করেন। নিজ হাতে ক্ষেত্রপালের মাথায় বেলপাতা ফুল চাপান ভক্তেরা। চিড়ে ফল দুধ দই নৈবেদ্য দেওয়া হয়। আজ প্রায় একশ' বছর ধরে চলে আসছে এই লৌকিক দেবতার আরাধনা। ▯

নেত্রদান মহাদান

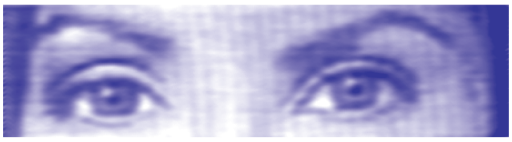

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

PIONEER®

নিখুঁত লেখার খাতা

প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature.......................... কলাম।

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road,
Kolkata - 10, Phone : 2373-0556, 2370-4152
Fax : 2373-2596,
E-mail : pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

কৃষ্ণ চরিত্র

প্রীতিমাধব রায়

জন্মাষ্টমী এক মহান উৎসব, কারণ তা পালন করা হয় পৃথিবীর সর্বকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের জন্মকে কেন্দ্র করে। আমাদের এই ধরণীতে বহু মহামানব জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের তুলনামূলক বিচার করার অধিকার আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের আছে কিনা সে প্রশ্ন উঠতেই পারে, কিন্তু কোনও ব্যক্তি মানুষকে যদি কোনও আদর্শ জীবনকে অনুসরণ করতে হয়, তাহলে একজন আদর্শ মানুষকে তো বেছে নিতেই হয়; সেই দিক থেকে শ্রীকৃষ্ণ আমার আদর্শ মানুষ।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণচরিত্রে কৃষ্ণকে আদর্শ মানুষরূপে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য এমন পণ্ডিত অনেক আছেন যাঁরা কৃষ্ণকে এক কল্পিত ধর্মীয় চরিত্র বলে মনে করেন, কৃষ্ণ কোনওদিন মানবদেহে পৃথিবীতে ছিলেন এমন মনে করেন না। একথা সত্য যে মহাকাব্য, পুরাণাদির মধ্যে এমন অনেক কথা আছে, যা বাস্তববুদ্ধিতে অতিরঞ্জিত, এমন কি অবিশ্বাস্য বলা যায়, কিন্তু উপনিষদ যেখানে কোনও তথ্য উপস্থাপিত করে সেখানে তাকে ভুল বলা যায় না।

কোনও গ্রন্থে কিছু অবিশ্বাস্য কথা থাকলেই, সেই গ্রন্থের মূল কথাটি ভুল এমন কথা বলা যায় না। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে ও বাইবেলে এমন কথা অনেক আছে, যা বাস্তব বুদ্ধিতে অবিশ্বাস্য বলা যায়, কিন্তু তাতে বোঝায় না যে, বুদ্ধদেব বা যীশুখৃস্ট বলে কেউ কোনওদিন ছিলেন না।

যীশু খৃস্টের জীবন লিখিত আছে চারটি গসপেল-গ্রন্থে। ওই জীবন কথাগুলি অসম্পূর্ণ, যীশুর জীবনের একটি দীর্ঘকাল তিনি কোথায় ছিলেন, কি করেছিলেন, তা কোনও গসপেলেই লেখা নেই। তাঁর স্পর্শে মৃত জীবিত হলো, কুষ্ঠরোগী ও অন্ধ নিরাময় হলো, মৃত্যুর পর তিনি তাঁর সমাধিস্থল থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, তাঁর জন্ম তাঁর পিতামাতার মিলন থেকে হয়নি, পবিত্র আত্মা মেরীর গর্ভে প্রবেশ করায় তাঁর জন্ম। এসব কথা যুক্তিবাদীগণ অবিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু যীশু মানবদেহে পৃথিবীতে বিচরণ করেছিলেন, একথা অবশ্যই সত্য। ভাগবতে কৃষ্ণের জীবনকথা পরিপূর্ণ রূপে বিধৃত, ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে যে, আঙ্গিরস বংশীয় ঘোর ঋষি দেবকী পুত্রকে উপদেশ দেন। পাণিনি সূত্রে বাসুদেব ও অর্জুনের উপাসকমণ্ডলীর কথা আছে। যাকে অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন যে, কেবলমাত্র উদাসীন, কৌপীনধারী, নির্মল ধর্মবেত্তা হলেই সম্পূর্ণ মানুষ হয় না। ব্যবহারিক পৃথিবীতে প্রতিবাদহীন, সর্বক্ষেত্রে অহিংসাবাদী— যিনি অত্যাচারী আততায়ীর বিরুদ্ধেও প্রতিরোধে অনিচ্ছুক, তিনি আদর্শ পুরুষ নন। যাঁরা সর্বগুণ বিশিষ্ট, সম্পূর্ণ পুরুষ তারা 'সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন, কামুক হইয়াও ধর্মবেত্তা, রাজা হইয়াও পণ্ডিত, শক্তিমান হইয়াও সর্বজনে প্রেমময়। কৃষ্ণ সেই আদর্শ পুরুষ। যুধিষ্ঠির তাঁর কাছে ধর্মশিক্ষা করেন। অর্জুন যাঁর শিষ্য, রাম ও লক্ষ্মণ তাঁর অংশ, তাঁর তুল্য মহামহিমায় চরিত্র কখনও মনুষ্য ভাষায় কীর্তিত হয়নি।

অহিংসা মহাগুণ। কিন্তু যেখানে অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, সেখানে নীরবে অত্যাচার, অন্যায়, শোষণকে ক্ষমা করিলাম বলে উপেক্ষা করা ক্লীবতা। মহাপুরুষ যীশু অনেক সদুপদেশ দিয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর প্রধান মাহাত্ম্য একগালে চড় মারলে অন্য গাল বাড়িয়ে দেওয়াতে নেই। অপমানিত, লাঞ্ছিত ইজরায়েল জাতিকে সংঘবদ্ধকরা, দুর্বলের পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলাতেই আছে। গৌতম বুদ্ধ ছিলেন অহিংসার প্রতিমূর্তি, কিন্তু অজাতশত্রু যখন মগধের সন্নিকটের গণরাজ্যগুলিকে বলপূর্বক দখল করার চেষ্টা করেন, তখন তিনি সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে গণরাজ্যগুলিকে সংগঠিত প্রতিরোধের উপদেশ দেন। আধুনিকতরকালে মুসলমান বাহমনী সুলতানগণের আক্রমণের প্রতিরোধে দক্ষিণ ভারতে মহান হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরে রাজ্য গড়ে তোলেন সন্ন্যাসী শঙ্কর বিদ্যারণ্য, হরিহর ও বুক্কের মাধ্যমে। আওরঙ্গজেবের নিষ্ঠুর আক্রমণের বিরুদ্ধে শিবাজী মহারাজ

যে সকল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন তার প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন সন্ত রাম দাস। এই উদাহরণগুলি প্রমাণ করে যে, দেশ যখন আক্রান্ত হয়, বিধর্মী যখন ধর্মের বিনাশসাধনে অগ্রসর হয়, তখন প্রকৃত ধার্মিক পুরুষ ঘরে বসে জপ করেই ক্ষান্ত থাকেন না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে অর্জুন যখন যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হন, তখন তিনি নিজের ক্লৈব্যকে ধর্মকথার দ্বারা আবৃত করার চেষ্টা করেন, তখন কৃষ্ণ তাঁর ক্লৈব্য দূর করতে যে মহান উপদেশ দেন, তাই হলো শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা। কিছু অর্বাচীন নীতিবাদী এমন কথাও লিখে গেছেন যে, কৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে উৎসাহিত করে যুদ্ধবাদীর কাজ করেছেন। এই মনোভাব একেবারেই অসাড়। যুদ্ধ যতদূর সম্ভব না করাই উচিত, কিন্তু যুদ্ধে রক্তপাত হবে এই যুক্তিতে চরম অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করার মতো অন্যায় আর কিছু হয় না। কৃষ্ণ যে যুদ্ধের সমর্থক নন, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ কৌরবসভায় তাঁর দৌত্যে পাঁচখানি গ্রাম নিয়ে শান্তি প্রস্তাব। কিন্তু দুর্যোধনের দম্ভ ও লোভ সেই শান্তি প্রস্তাবকে উপেক্ষা করে। সেক্ষেত্রে, কোনও মানুষেরই কর্তব্য হতে পারে না ক্লীবের মতো আত্মসমর্পণ করা। আর অত্যাচারীর কাছে আত্মসমর্পণ করে রক্তপাত বন্ধ করা যায় না।

রুশ-জার্মান যুদ্ধে রুশ দেশের কমপক্ষে তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ মানুষ নিহত হলো। অসংখ্য মানুষের জীবনে নেমে আসে অসহনীয় দুঃখ। স্ট্যালিন যদি প্রথমেই হিটলারের কাছে আত্মসমর্পণ করতেন তাহলে অনেক লোকের জীবন রক্ষা পেত এমন একটা যুক্তি উপস্থাপিত করা যায়, কিন্তু এই যুক্তি একেবারেই কুযুক্তি। নাৎসী ও ফ্যাসিস্ট শক্তি যে সমগ্র পৃথিবীতে অপশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি তার কারণ হলো মূলত রুশ প্রতিরোধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে যখন হিটলার ক্রমশ সমরশক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে, প্রথমে অস্ট্রিয়া ও তারপর চেকোস্লোভাকিয়া দখল করে, তখন যদি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন ও ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দালাফিয়ের ক্লীবতা না দেখিয়ে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ করতেন, তাহলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আদৌ শুরু নাও হতে পারত। যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য আগ্রাসী শক্তিকে তুষ্ট করার অপচেষ্টা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ।

ভারত বিভাগ এই ক্লীবতার অন্যতম উদাহরণ। জিন্নার দাবী মতো পাকিস্তান মেনে না নিলে সারা ভারতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধ হবে। এই কুযুক্তি দিয়ে ক্লীব ও লোভী কংগ্রেসী নেতারা পাকিস্তান মেনে নিয়ে ভয়াবহ রক্তপাত, লুণ্ঠন, নারীর চরম লাঞ্ছনা বন্ধ করতে পারেননি। সেই সময়ের কথা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, পাকিস্তান মেনে নেওয়ার আগে কলকাতা, নোয়াখালি, বিহার প্রভৃতি স্থানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যত ক্ষতি হয়েছে, পাকিস্তান মেনে নেওয়ার পর উভয়দিকে তার থেকে বহুগুণ বেশি ক্ষতি হয়েছে। প্রথমেই পাকিস্তানের দাবী অস্বীকার করে রাষ্ট্র ক্ষমতার পূর্ণব্যবহার করলে এই ক্ষতি অনেকাংশে কম হোত। জিন্নার লোভে ক্লীবতার আহুতি দিয়ে কেবল রক্তস্রোতই বৃদ্ধি পায়নি, ভারতভূমির পক্ষে এক চিরন্তন বিপদ গড়ে তোলা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কেবল কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে জ্ঞাতি বিবাদ নয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অনেক আগে থেকেই সমগ্র ভারতের ক্ষাত্রশক্তি দুই ভাগে ভাগ হয়েছিল। যেমন, অধুনাকালের দুইটি বিশ্বযুদ্ধের আগে বিশ্বের দেশগুলি দুটি পক্ষে বিভক্ত হয়েছিল মিত্রশক্তি ও অক্ষশক্তি নামে। দ্বাপরযুগে কৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছিল ভূভার হরণের জন্য। অন্যায় যে বা যাঁরা করবে তারাই শাস্তি পাবে এই ছিল কৃষ্ণের নীতি। ধর্মপক্ষ ও অধর্মপক্ষের মধ্যে মহারণ শুরু হওয়ার আগেই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কৃষ্ণ অশুভপক্ষের প্রধান শক্তিগুলিকে ধ্বংস করেছিলেন, যাদের মধ্যে ছিল নিষ্ঠুর শিশু হত্যাকারী, পিতৃদ্রোহী কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধ প্রভৃতি। তাঁরা কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে অধর্মপক্ষের শক্তিবৃদ্ধি করার সুযোগই পাননি। কিন্তু ভগবান কৃষ্ণকে কেবল রাজনীতিবিদ বা সমরবিদ বললে তাঁর উপর অবিচার করা হবে। তাঁর বহু উপদেশের মধ্যে দুইটি উপদেশাবলী সর্বকালের বিশ্বমানবের পক্ষে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা স্বরূপ। এর প্রথমটি হলো গীতা, যা যুদ্ধারম্ভের প্রাক্কালে প্রদত্ত অর্জুনের মাধ্যমে ও দ্বিতীয় কৃষ্ণের দেহত্যাগের প্রাক্কালে উদ্ধবের মাধ্যমে প্রদত্ত হয়েছিল, যা লিখিত রয়েছে ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে। এই দুটি সর্বকালীন মানব সমাজের জন্য পরম শিক্ষা, যাদের উপযোগিতা বর্তমানকালেও বর্তমান।

কৃষ্ণের মধ্যে আমরা দেখি দুটি মহত্তম ভাবের সমন্বয়। একদিন বাস্তবসম্মত কর্মভাব, অপরটি আধ্যাত্মিকতা পূর্ণ অহিংসা ও প্রেমভক্তি ভাবের প্রকাশ যা বর্তমানকালে সম্পদ ও শক্তিমত্ত পাশ্চাত্য দেশগুলিতে নাম, প্রেম ও আনন্দের মধ্যে সঞ্চারিত। বিষয়ক্লান্ত প্রতীচ্য এই প্রেমধর্মের মধ্যে পেয়েছে এক পরম শান্তির আশ্বাস।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণচরিত্রে কৃষ্ণের কার্যকলাপের অনেক অংশ অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য বলে বাদ দিতে চেয়েছেন। তাঁর মতে ঐগুলি প্রক্ষিপ্ত। যেমন, যমলার্জুন উদ্ধারকে তিনি বলবান শিশুর দ্বারা দুইটি কুরচিগাছ ভাঙ্গার কথা বলেছেন। কিন্তু এই বিচার ধারাকে সঠিক বলা যায় না। দুটি কুরচিগাছ ভাঙ্গা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু তাকে দীর্ঘকাল ধরে কৃষ্ণমাহাত্ম্য রূপে প্রচার করা অর্থহীন। আসলে, ওই তথাকথিত অলৌকিক কাহিনীগুলিকে রূপক ভাবে দেখাই সঠিক। জগতে বহুগ্রন্থে এই ধরনের রূপককে কোনও ভাব বা আদর্শরূপে প্রচার করা হয়, তাকে মিথ্যা বলা উচিত নয়। কৃষ্ণ জীবন ও শিক্ষা অনুসরণের সর্বশ্রেষ্ঠ মার্গ। যে অনুসরণ সমগ্র মানবসমাজকে শ্রেষ্ঠজীবনে উত্তরিত করতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র একেই অনুশীলন মার্গ বলেছেন। বর্তমানের অবক্ষয়ী মানব সমাজের মুক্তির মার্গ হলো কৃষ্ণানুশীলন। □

সুকুমার রায় : ১২৫

লাইব্রেরিতে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান

লাইব্রেরিতে ঢোকার মুখে কথাগুলো দেখতে পেলো দেবাদৃতা। 'মাথা উঁচু করে এখানে ঢুকুন। এটা ঠাকুর ঘর নয়। ডাকাতের ডেরা নয়। দল দপ্তর নয়।' পাশাপাশি রয়েছে আরেকটা লেখা : 'এসো, এখানে এসো, এখানে আলোকের জন্মসংগীত গান হইতেছে।' দেবাদৃতা আগে জানত না শেষ কথাটা কার লেখা। পরে দাদুর কাছে জেনেছে রবীন্দ্রনাথের। বাবা রচনাবলী খুলে দেখিয়ে দিয়েছে। লাইব্রেরির সঙ্গে ওদের বাড়ির খুব ভালো সম্পর্ক। প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু পড়ে প্রতিদিন। বাড়িতেও অনেক বই রয়েছে। দেবাদৃতা বছরে কয়েকবার বই উপহার পায়। নিজেও কিছু পছন্দের বই কেনে। বাবা-মা-দাদু-পিসি বই কেনার জন্যে টাকা দেয়। দেবাদৃতা কয়েকজনকে উপহার দেয়, যাদের বাড়ির অবস্থা ভালো নয়। বই নিয়ে মাতামাতিতে সে সবসময় তৈরি। উৎসাহ পায়।

সুকুমার রায়ের জন্মের একশ পঁচিশ বছরে লাইব্রেরিতে ছোটোদের বিভাগে একটা প্রদর্শনী হবে ঠিক হলো। লাইব্রেরিয়ান রজত রায়কে দুবার বলতেই তিনি রাজি। তিনি জানালেন দেবাদৃতাকে, 'তুমি এক ঘণ্টা বাদে আমার সঙ্গে দেখা করো, তখন জানাতে পারবো কি কি বই দেওয়া যাবে।' একঘণ্টা নিজের পড়াশোনা করে লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে দেখা করল দেবাদৃতা। তিনি একটা টাইপ করা কাগজ ধরিয়ে দিলেন হাতে। তাতে লেখা : 'সুকুমার রায়ের কোন কোন বইয়ের প্রথম সংস্করণ দেওয়া যাবে। বিভিন্ন প্রকাশনের বই কীভাবে বেরিয়েছে তারও কিছু দিতে পারবো।'

দেবাদৃতা ঠিক করল লাইব্রেরির কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে অনুষ্ঠান কেমন হবে। ছোটোরা সুকুমার রায়ের লেখার কোন কোন চেনা চরিত্র নিয়ে ছবি আঁকবে। সেসব ছবির প্রদর্শনী হবে। সুকুমার রায়কে নিয়ে কেউ কেউ লিখবে। সুকুমার রায়ের বইয়ের বিভিন্ন সংস্করণ নিয়ে প্রদর্শনী হবে। প্রদর্শনী সাজাবার জন্যে সুকুমারের আঁকা কিছু ছবির বড়ো প্রিন্ট থাকবে। সুকুমার সম্বন্ধে যাঁরা লিখেছেন অনেকে। বাছাই করা হবে তা থেকে। ছোটোরা আবৃত্তি করবে। পড়বে। ছড়ার গান করবে। নাটকের অভিনয় হবে না, তবে নির্বাচিত অংশ পড়া হবে। সুকুমার রায়কে নিয়ে বলবেন ছোটোদের খুব চেনা কোনও লেখক, যিনি ভালো বলেনও। সারাদিন ধরে অনুষ্ঠান হবে। মোটামুটি কত খরচ হবে সে হিসেবও করে দিলেন ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী। দেবাদৃতার বাবার বন্ধু। সেজন্যে ইন্দ্রজিৎকাকু বলে। খরচ সামলানো যাবে কীভাবে? রজত রায় নিজে এক হাজার টাকা দেবেন বললেন। নামের তালিকা তৈরি হলো। সকলেই রাজি। ছোটোদের জন্যে অনুষ্ঠানে হলেও বড়োরাও থাকবেন। অনুষ্ঠান শেষে একটু খাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। সেই খরচটা পুরো দেবে বলল দেবাদৃতার পিসেমশাই। সাজাবার দায়িত্ব নিলো ছোটোরাই। সব দেখিয়ে দেওয়ার জন্যে থাকলেন গায়ত্রী, বিশাখা, রুণু, নমিতা, নন্দিতা। এদের সবাইকে দেবাদৃতা পিসি বলে। বড়োরা উৎসাহে এগিয়ে এলো। সেজে উঠল লাইব্রেরির অঙ্গন। প্রথমে কয়েকজন মিলে কাজ শুরু হলেও পরে অনেকে মেতে উঠল। কাজটা যেন সকলের। দেবাদৃতাকে না জানিয়েই তার বাবা ঠিক করেছিল, প্রত্যেককে সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' এর একটা কপি উপহার দেবে। বাজারে অনেকরকম সংস্করণ আছে। বেছে নেওয়া হয়েছিল মূল সংস্করণ। যে বই বেরিয়েছিল সুকুমারের মৃত্যুর ন'দিন বাদে। নব্বই বছর আগে।

ছোটোরা প্রায় সকলেই চেনে রিক্সাওয়ালা রামশরণকে। তার বাড়ি ভাগলপুরে। ছোটোদের স্কুলে নিয়ে যায় যত্ন করে। অনেক বছর ধরে এক কাজ করায় সকলের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক। রামশরণ বলল, 'ওদিন আমাকে দিয়ে তোমরা যে কোনও কাজ করিয়ে নিও। পয়সা লাগবে না।' দেবাদৃতা তার বাবাকে বলল, 'রামশরণ উৎসাহে কাজ করছে। তুমি ওকে ধুতি জামা গেঞ্জি দিও। টাকা দিলে নেবে না।'

সেদিন রাত দশটায় অনুষ্ঠান শেষ হলো। সকলের মনে দাগ কাটল অনুষ্ঠান। অনেকে ছবি তুলেছে। দেবাদৃতা সেসব পরে দেখবে। সকলে তারিফ করল তার। দেবাদৃতা বলল, 'অনুষ্ঠান ভালো হয়েছে এজন্যে কৃতিত্ব সকলের। কারণ সুকুমার রায় আমাদের প্রত্যেকের অতি আপনজন, আত্মীয়।' একথা সে অনুষ্ঠানের প্রথমে আর শেষে বলেছিল। কথাটায় সায় দিয়েছিলেন সকলে।

কৌশিক গুহ

বই কথা কই

বইয়ের টানে সবাই আসুক

সকলের হাতে বই পৌঁছে দেওয়ার কথা সবসময় বলেন সনৎ মুখোপাধ্যায়। বই নিয়ে তাঁর ভাবনা কম নয়। বলেন, 'যারা বইকে ভালোবাসতে পেরেছে তাদের নিয়ে চিন্তা নেই। কিন্তু যারা বই থেকে দূরে থাকতে চায় বা বাধ্য হয় তাদের নিয়েই ভাবনা। বইকে পৌঁছে দিতে হবে তাদের নাগালে। কীভাবে তারা বইয়ের টানে ছুটে আসবে সে সম্পর্কে ভাবা চাই।'

আমাদের সামনে নেই কোনও বাঁশিওয়ালা যাদুকর, যে সমস্ত শিশুকে কোথাও জড়ো করতে পারে আনন্দে। কিন্তু নানারকম বই ছড়িয়ে ছোটোদের ডেকে আনা সম্ভব। তাদের ঠিকমতো মাতিয়ে তোলা যায়। আবার কেউ কেউ বই থেকে দূরে থাকতে চাইবে। কালো কালো অক্ষর আর ছবিটবি পড়তে চাইবে না। কিন্তু একবার মাতিয়ে দিতে পারলে দারুণ মজা। সনৎ বলেন, 'একটু ধৈর্য নিয়ে ছোটোদের সঙ্গে কাজ করলে অনেক শেখা যায়। তাদেরও শেখানো সম্ভব। ছোটোদের জন্যে কাজে মেতে থাকতে হয় হিসেবের অঙ্ক ভুলে।'

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. বাংলা ভাষায় প্রথম সবাক চলচ্চিত্র? কবে মুক্তি পায়? কোথায়? ভারতের প্রথম সবাক চিত্র? কোন্ সময়ে?

২. রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কোন সময়ে প্রতিষ্ঠিত? প্রথম উপাচার্য কে?

৩. 'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্র কবে মুক্তি পায়? পরিচালক? কাহিনীকার কে? তিনি কি তখন জীবিত ছিলেন?

৪. রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে কবিকে নিয়ে যে তথ্যচিত্র তৈরি হয় তার প্রযোজক কে? পরিচালক? ভাষ্য লেখক ও পাঠক?

৫. যামিনী রায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—দুজনের পরিচয়? একসময় দুজনে কোথায় প্রতিবেশী ছিলেন?

উত্তর : ১. জামাইষষ্ঠী। ২৫ এপ্রিল ১৯৩১। শ্যামবাজারে ক্রাউন টকি হাউসে। আলম আরা। ১৯৩১-এ, কিছু আগে। ২. ৮ মে ১৯৬২। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩. ২৬ আগস্ট ১৯৫৫। সত্যজিৎ রায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রয়াত হয়েছেন। ৪. ভারত সরকার। সত্যজিৎ রায়। সত্যজিৎ রায়। ৫. একজন চিত্রকর। অন্যজন সাহিত্যস্রষ্টা। বাগবাজারে আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে।

ছোটোদের বলছি

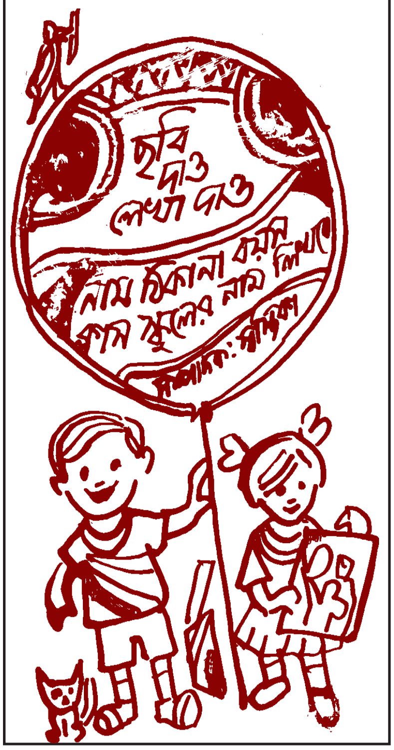

উলটো পালটা

শ্যামল মুখোপাধ্যায় পয়সার হিসেব ভালো বোঝে। কাজ করে মন দিয়ে। পারিশ্রমিক কম দিলে যা খুশি বলে দেয়। কিছুদিন আগে মালিক অরূপ রায়কে জানিয়েছিল, 'চার মাসের টাকা একসঙ্গে নেবে।' টাকা দেওয়ার সময় অরূপের ভাই নিরূপ বলেছিল, 'এতগুলো টাকা নেবেন?' শ্যামলের উত্তর সঙ্গে সঙ্গে, 'হ্যাঁ, নিচ্ছি। যদি মনে করেন বাইরের লোকেরা অনেক টাকা নিয়ে যাচ্ছে তাহলে আপনারা তিনভাই সব কাজ করুন। ঘরের টাকাই ঘরেই থাকবে।'

।। ২।।

রণেন সরকার অফিসে দেরি করে ঢোকে। গল্প করা কাগজ পড়া টিফিন খাওয়ায় কেটে যায় দু' ঘণ্টা। ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখে। পরিচালকদের বলে দিয়েছে স্পষ্ট ভাষায়, ' আমি দুবার দেরি করতে পারবো না। সেটা ঠিক নয়। অফিসে ঢুকবো দেরি করে। বেরোবার সময় দেরি নয়, আগে যাওয়াই পছন্দ করি। আর বাড়তি সময় থাকলে বাড়তি টাকা দাবি করবো।'

।। ৩।।

জগন্নাথ ঘোষ। অনেক বিষয়ে ভালো বলেন। তাঁকে বিভিন্ন সংস্থা আমন্ত্রণ জানায়। কেউ কেউ বক্তৃতার জন্যে ভালো দক্ষিণা দেয়। কেউ শুধু উপহার-টুপহার দেয়। কেউ আবার কিছু দেয় না। ইদানিং অনেকরকম অভিজ্ঞতা হচ্ছে। সেজন্যে কোথাও বক্তৃতা দিতে যাওয়ার আগে জানতে চান, 'আর কে কে বক্তা?' কারও কারও নাম শুনে বলেন, 'ঠিক আছে।' আবার কারও নাম প্রথম শোনেন। তখন প্রশ্ন করেন, 'বক্তৃতা তো করবে। থামতে জানে তো?'

রামগরুড় সংকলিত

অঙ্গনা

পশ্চিমবঙ্গে নারীদের নিরাপত্তা

কৃষ্ণকলি মুখার্জী

সম্প্রতি আলোর মালা আর বিজয় গানের সুর মূর্ছনায় পালিত হলো পশ্চিমবঙ্গের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের ব্যস্ততম পথের অলিতে-গলিতে সকাল থেকে রাত অবধি ধ্বনিত হচ্ছিল শুধুই পরিবর্তন নিয়ে রচিত গানের সুর। আমাদের রাজ্য সরকারের ভাষায় তা হলো 'পরিবর্তনের গান'। একশ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছিল পরিবর্তনের স্মারক গ্রন্থ। এসব সত্ত্বেও সমাজের সর্বস্তরের মানুষের বিশেষত বাংলার মা-মাটি-মানুষের প্রশ্ন একটাই— সত্যিই কি বিগত এক বছরে পশ্চিমবঙ্গ সার্বিক এবং সামগ্রিক পরিবর্তনের স্বাদ পেতে শুরু করেছে? ১৩ মে-র পর একদিন একদিন করে কেটে যাওয়া ৩৬৫টা দিন নেহাতই কম সময় নয়। এই সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে ধ্বনিত হচ্ছে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশাময় হৃদ্‌স্পন্দন।

সময়ের চাকাকে যদি একটু বিপরীত দিকে ঘোরানো যায় তাহলে এই চূড়ান্ত পরিবর্তনের সুরের জোয়ারে কোথায় যেন ভাটা পড়েছে, ঘটেছে ছন্দপতন। ১৩ মে ২০১১, এরপর থেকে পশ্চিমবঙ্গে নারী সুরক্ষা বিষয়ক প্রশ্নটা যেন বড়ই অনিশ্চয়তায় কবলিত। ফেব্রুয়ারি মাসের পার্ক স্ট্রীট কাণ্ড থেকে শুরু করে বিচ্ছিন্নভাবে ঘটে চলা একের পর এক ধর্ষণকাণ্ড যেন সমাজের ন্যক্কারজনক বে-আব্রু রূপটিকে মেলে ধরেছে। বাংলার মা-বোনেদের সুরক্ষার বিষয়টা অনিশ্চিত হয়ে পড়বে তা বোধহয় পরিবর্তন আনার পূর্বে আমরা কল্পনাও করিনি। প্রাক্তন সরকারের আমলে যে ধর্ষণকাণ্ড ঘটেনি তা নয়, কিন্তু এ যেন ধর্ষণের বন্যা! আর তা সমাজের বুকে লজ্জাজনক। এর থেকেও বিস্ময়কর ঘটনা প্রতিটি ধর্ষণকাণ্ডে রাজ্য সরকারের প্রতিক্রিয়া। সাধারণ মানুষের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, বাংলার মা-মাটি-মানুষ কি সত্যিই পরিবর্তনের খুশীতে হাসছেন? নাকি প্রদীপের তলায় অন্ধকারের মতো সেই হাসির আড়াল লুকিয়ে আছে প্রগাঢ় চাপা কান্না। প্রাক্তন সরকার ধোয়া তুলসীপাতা নয় একথা ঠিকই, কিন্তু বর্তমান সরকারের নীতির মধ্যে চিন্তাধারাগত বেশকিছু ত্রুটি বর্তমান রয়েছে। পার্ক স্ট্রীট কাণ্ডের মীমাংসার পরপরই শ্রীমতী দময়ন্তী সেনের আকস্মিক বদলি কোনওমতেই সুস্থ মানসিকতার সিদ্ধান্ত হতে পারে না। আমাদের রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বিনা প্রমাণে বারংবার ধর্ষিতাদের কটাক্ষ করে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গীমায় প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ধর্ষণগুলি পূর্ব পরিকল্পিত এবং সাজানো। এই ঘটনা মোটেই কোনও রাজনৈতিক বিচারের আদর্শ রূপ হতে পারে না। প্রত্যেকদিন ঘটতে থাকা ঘটনাগুলিতে সরকার পক্ষের বিচার ভঙ্গিমা দেখে মনে হয় এ যেন হিটলারি জামানা। কালীঘাট কাণ্ডে পুলিশ প্রশাসনের যে ভাবমূর্তি আমরা দেখি তা ধিক্কারযোগ্য। একটি চূড়ান্ত নির্মম ঘটনায় আকস্মিকভাবে জর্জরিত বিবাহিত মহিলা থানা থেকে সাহায্যের বিনিময় যে অপমান যে লাঞ্ছনা ভোগ করে তা আমাদের সকলের কাছেই চরম লজ্জার। কিন্তু কতটা উপযুক্ত শাস্তি আদপেও সেই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গৃহীত হয়েছে তাও প্রশ্নের মুখে।

সল্টলেক সিটি সেন্টার, ইস্টার্ন বাইপাস, পরমা আইল্যান্ড, পার্ক স্ট্রীট প্রভৃতি জায়গাগুলিতে একটু বেশি রাত্রে যখন পুলিশদের পাহারাটা জোরদার হওয়া খুবই প্রয়োজনীয়, তখন প্রতিটি পুলিশ বুথই ফাঁকা পড়ে থাকতে দেখা যায়। আমাদের সমাজে ইভটিজারকে পুলিশ গ্রেফতার করলেও সামান্য ক'টা টাকার বিনিময় পরদিন তাকে ছেড়ে দেয়। আর ওই ইভটিজারকে হাতে তুলে দেয় বিপন্ন নারীকে শাসানোর সুযোগ। অথচ সামান্য রসিকতার বশবর্তী হয়ে আঁকা কার্টুনের জন্য একজন অধ্যাপককে থানায় তুলে নিয়ে গিয়ে নির্বিচারে হেনস্থা করতে পিছপা হয় না বর্তমান পুলিশ প্রশাসন। যদি পরিবর্তনের রূপ এমন হয় তবে এই পরিবর্তন আমাদের কাম্য নয়। সরকার ভাঙে সরকার গড়ে, জনগণের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে, দশের স্বার্থে। ক্ষমতায় আসার প্রথমদিন থেকে রাজ্য সরকার বলে এসেছেন আমাদের রাজকোষ নাকি শূন্য! কিন্তু ৫০ লক্ষ টাকার বেশি খরচ করে কলকাতার নাইটদের আই পি এল বিজয়ের উপলক্ষে সোনার লকেট চেন দিতে রাজকোষে টান পড়ল না। এই সোনা প্রদানের থেকে রাজ্যকে নারী সুরক্ষা প্রদান করাটা অনেক জরুরি একটি বিষয়। কলকাতার আই পি এল জয় নিঃসন্দেহে খুশীর খবর।

কিন্তু সরকারের সামান্য উদ্যোগে যদি বাংলার মা-বোনেরা বিপদকে জয় করে মাথা উঁচু করে সুরক্ষিত জীবন যাপন করতে পারেন, তবে তা হবে পশ্চিমবাংলার গর্বের। আমাদের চাই সুস্থ আনন্দময় পরিবর্তন, চাপা কান্নার হাহাকার নয়। ▯

দাদাগিরি প্রয়াত হয়েছেন
এক মিনিট নীরবতা পালন করুন

মাননীয় শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী
সিটু সভাপতি, শ্রমিক ভবন
কলকাতা

কমরেড চক্রবর্তী,

একটু উঠে দাঁড়াবেন প্লিজ। বেশিক্ষণ নয়। মাত্র ৬০ সেকেন্ড।

হ্যাঁ, হয়েছে। এবার বসতে পারেন। জানি এই বয়সে দাঁড়ানো কঠিন। কিন্তু আপনার হাতেই যে দাদাগিরির শেষ নিঃশ্বাস নির্গত হয়েছে। প্লিজ ভবিষ্যতে আর তাকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করবেন না। সমালোচকরা বলছে ধর্মঘট ডেকে এবং পরে তা তুলে নিয়ে আপনি থুতু চেটেছেন, কেউ বলছেন ঢোক গিলেছেন। মোসায়েবরা বলছে, এটা নাকি 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা'। আর আশাবাদীরা বলছেন, আপনাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হয়েছে।

কিন্তু শ্যামলবাবু, আমার মতো আপনিও জানেন যে, এটা আসলে দাদাগিগির মৃত্যু। বামফ্রন্ট নামক একটা গণতান্ত্রিক ধোঁকা আপনারা মানে সিপিএম বহুদিন চালিয়ে এসেছেন। কথায় কথায় স্লোগান দিয়েছেন 'বাম ঐক্য জিন্দাবাদ'। কিন্তু সেটা যে আষাঢ়ে গল্প সেটা সবাই জানত। কিন্তু বলার উপায় ছিল না। নানা ইস্যুতে ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা অশোক ঘোষসহ অন্যান্য শরিকরা বহুবার ফোঁস করেছেন কিন্তু ছোবল মারার সাহস হয়নি। জেলায় জেলায় আপনাদের দলের সম্পদ হার্মাদদের হাতে শরিক ভাইয়েরা ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন, প্রাণ দিয়েছেন কিন্তু বামফ্রন্টের বৈঠকে ঐক্যের জয়ধ্বনি শোনা গেছে। আসলে জেলায় জেলায় কর্মীদের সামনে গলার শিরা ফোলালেও আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের চৌহদ্দির মধ্যে কারও ট্যাঁ ফোঁ করার জো ছিল না। আসলে আপনাদের দাপটের কাছে সবাই ম্রিয়মান হয়ে থাকত। বুকে জ্বালা নিয়েও ফ্রন্টীয় নির্দেশ মেনে মেরুদণ্ডহীনের মতো বিমান বসুকে আলিঙ্গন করতে হোত। পরদিন খবরের কাগজে সেই জড়িয়ে ধরা ছবির ক্যাপশন হোত লড়াই শেষ। বাম ঐক্য জিন্দাবাদ।

কিন্তু সত্যিই কি ঐক্য ছিল? ঐক্য জিনিসটা কিন্তু অন্যরকম। সেখানে বিপদে আপদে একসঙ্গে থাকার কথা। কিন্তু আপনাদের সঙ্গ ছাড়লে ক্ষমতার মধুও মিস হয়ে যাওয়ার ভয়ে এতদিন শরিক ভাইয়েরা দাপট দেখাতে পারেনি। এখন আপনার যখন নখদন্তহীন কাগুজে বাঘের ছবি তখন আর ভয় কি? আঁচড়ে দেওয়ারও ক্ষমতা নেই। কামড়ে দেওয়ার হিম্মত নেই। সুতরাং আপনাদের নিষেধ এখন শরিকদের কাছে 'বলছে বলতে দে'।

শ্যামলবাবু, এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, আপনাদের সঙ্গে শরিকদের ভালবাসাটা ঠিক কেমন। ভয়ে ভক্তি ছিল, ভয়ে ভালবাসা ছিল। এখন ভয় নেই। তাই ভক্তি আর ভালবাসাও লোপাট। তা নাহলে ভাবতে পারেন মহাপরাক্রমশালী সিটুর ডাকা ধর্মঘটকে স্রেফ তোয়াক্কাই করল না শরিক চুনোপুটিরা। পরিষ্কার বলে দিল, একা ডেকেছে, একা সামলাও। আমরা সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। তবে প্যাঁচে আছি। যেমন সবাই মিলে প্যাঁচ দিয়ে কেমন পরিবহণ ধর্মঘটের থুতু চাটালাম।

আপনি অত ঘাবড়াবেন না, আপনাদের মূল দল সিপিএমও এসব বুঝেছে। কারাট, বুদ্ধদেব, বিমানবাবুরা রাষ্ট্রপতি ভোটের সমর্থন নিয়েই তোপ দেগে বুঝিয়ে দিয়েছেন সেই বামও নেই, সেই রামায়ণও নেই। আলিমুদ্দিনের অতদিনের বন্ধু প্রণব মুখোপাধ্যায়কে সিপিএম তো সমর্থন করবেই। আর তাতে বশংবদের মতো শরিকরা বড়দাদার কথায় ঘাড় কাৎ করবে একেবারে ৪৫ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে। কিন্তু কোথায় কি? আর এস পি, সিপিআই এর মতো এলেবেলে পার্টি পাত্তাই দিল না। আপনাদের কল্যাণে মন্ত্রী থাকা ক্ষিতি গোস্বামী তো বলেই দিলেন বড়দা যদি বেপাড়ার প্রণবদার সঙ্গে অত মেলামেশা করে তবে আর এক সংসারে থাকা যাবে না। হাড়ি আলাদা করতেই হবে। আর ফ ব তো কথায় কথায় ফোঁস করে। কি ঘোর কলি বলুন তো? ভাবা যায়?

আপনি পরিবহন ধর্মঘট তোলার সময় যে চিঠিটা পাঠ করলেন তাতে দেখলাম কমরেড বিমান বসু বেশ কিছু কারণ দেখিয়েছেন। যারা গোটাটাই অসার। লিখেছিলেন, যে যে দাবিতে আপনার ধর্মঘট ডেকেছেন তার সঙ্গে আরও কিছু বাড়তি দাবি নিয়ে বামফ্রন্টের বেশ কয়েকটি কর্মসূচি রয়েছে। তাই আলাদা করে ধর্মঘট না করলেই ভাল হয়। ব্যাস সেই চিঠিটি পেয়ে আপনি ধেই ধেই করে সাংবাদিক সম্মেলন করে দিলেন। কিন্তু সেসব কর্মসূচিতো অনেক আগেই ঠিক করা। পরিবহন ধর্মঘট ডাকা এবং তা নিয়ে বাজার গরম করার সময় আপনাদের মনে ছিল না যে সিঙ্গল দাবি নিয়ে ডাবল আন্দোলন হয়ে যাচ্ছে।

যাক, সত্য দাদাগিরি হারানো মনে আর কষ্ট দিতে চাই না। তবে বিমানদাদা আপনাকে ওই চিঠিটা দিয়ে সত্যিই বাঁচিয়ে দিয়েছেন। মনে করে ওনার পায়ে একটা লাল সেলাম দিয়ে আসবেন। বাস মালিকরা ধর্মঘট ডাকার পর আপনারা ভেবেছিলেন, একই দিনে শ্রমিকদের ধর্মঘট ডেকে দিই। বাস রাস্তায় না নামলে ড্রাইভার, কনডাক্টররাও নামবেন না। মুফতে সফল হয়ে যাবে পরিবহণ ধর্মঘট। কারণ, সমর্থনের পুঁজি আর নেই আপনাদের। এখন তো বিনা পুঁজির কারবারই খুঁজতে হবে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর লাইসেন্স বাতিল করার হুমকিতে ল্যাজ গুটিয়ে নিল বাস মালিকদের সংগঠনগুলো। তারপর মুখে হম্বি তম্বি করা সোজা কিন্তু একক ক্ষমতায় ধর্মঘট সফল করা, স্বপ্নেও ছেঁড়া কাঁথা। যাক্, বিমান বসুর চিঠিটা ধরেই ডুবতে ডুবতে ভেসে উঠেছেন এবার। তাই আগামী দিনগুলোও মনে রাখবেন, দাদাগিরির দিন শেষ হয়ে গেছে। বছর দেড়েক তো হয়ে গেল। এবার একটু একলা চলার অভ্যাস করুন। আমার সশ্রদ্ধ লাল সেলাম জানাবেন। প্রয়াত দাদাগিগির আত্মার শান্তি কামনা করি।

—সুন্দর মৌলিক

পশ্চিম এখন গভীর সঙ্কটে

আমাদের পুরোনো বন্ধু ডমিনিক স্ট্রস খান হঠাৎ আবার খবরের শিরোনামে চলে এসেছেন। এবারেও যথারীতি কুকারণে। এই ভদ্রলোক আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের (আই এম এফ) ভূতপূর্ব মুখ্য কর্তা তো ছিলেনই, সেইসঙ্গে একজন স্যোশালিস্ট অর্থমন্ত্রীর পদও অলংকৃত করতেন। তাঁর বিরুদ্ধে এখন নিকৃষ্টতম যৌন অপরাধ ঘটানোর দায় বর্তেছে। তিনি নাকি যুবতী মেয়েদের জড়ো করে রগরগে পাপচক্র চালাতেন। সহজভাবে বলতে গেলে এদের নানান যৌন ক্রিয়া কর্মে নিযুক্ত করার দালালি করতেন। ভাবা যায় আই এম এফ-এর চেয়ারম্যান পদে থেকে যৌনকর্মীর দালালি। এই ভদ্রলোকেরই এক সময় ফ্রান্সের সম্ভাব্য রাষ্ট্রপতি হওয়ার দৌড়ে নাম উঠেছিল। চমৎকার!

এমন একজন কদর্য রুচির মানুষকে রাষ্ট্রপতির মতো মর্যাদাসম্পন্ন পদে পাঠাবার কথা ফরাসীরা ভাবতে পারে কি করে সেটি একটি রহস্য হতে পারে। কিন্তু আজকের পশ্চিমের হাবভাব দেখে মনে হয় সেখানে কোনও কিছুই আর অঘটন নয়। সেখানকার ভোটাররা তাদের রাষ্ট্রপতি যৌনকর্মীর যোগানদার না দিনরাত সন্দেহজনক চরিত্রের মহিলার পেছনে ছুটে বেড়ানো কোনও ব্যক্তি— এসব নিয়ে আদৌ মাথা ঘামায় না। এ থেকেই বোঝা যায় আমাদের স্ট্রস খানও কোনও ব্যতিক্রম নন। সদ্য প্রাক্তন হওয়া ফরাসী রাষ্ট্রপতি নিকোলাস সারকোজি প্রেসিডেন্টের পদে আসীন হওয়ার আগেরদিন পর্যন্ত যৌন মডেলের পেছনে ধাওয়া করে বেড়াতেন। প্রেসিডেন্ট হওয়ামাত্রই তিনি তাঁর বিবাহিত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে ওই মডেলকে বিয়ে করে প্রাসাদে নিয়ে আসেন। এই মহিলা অবশ্য রাষ্ট্রপতির পত্নী হওয়া সত্ত্বেও অন্য পুরুষের সঙ্গে অবাধ সংসর্গ চালিয়ে যান। ফ্রান্সের নাগরিকবৃন্দের কেউই এনিয়ে উচ্চবাচ্য করেননি।

পাশ্চাত্যের অবস্থা :

আসলে সেই পশ্চিম আর নেই। পশ্চিম বা পাশ্চাত্য যা আদতে ইউরোপ আজ গভীর গাড্ডায়। তার অর্থনীতি আজ ক্রমক্ষয়িষ্ণু। সত্যি কথা বলতে কি ইউরোপীয় সভ্যতা আজ প্রায় ধ্বংসের মুখে। চীন ও ভারত যেখানে এগিয়ে চলেছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপ যাকে পাশ্চাত্য বলা হয় তা আজ ডুবন্ত জাহাজ। এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েই হয়তো এর মৃত্যুঘণ্টা বেজে যেতে পারে বা টিকে থাকলেও খুবই টিমটিমে অবস্থায় থাকবে এমনটাই বিশ্লেষকদের ধারণা। তবে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে--- পাশ্চাত্যের এই ক্রমিক অধঃপতনের জন্য এখানকার সমাজের সার্বিক চরিত্রহীনতাই কি দায়ী নয়?

এটা দীর্ঘদিন ধরেই স্বীকৃত যে পাশ্চাত্য সমাজ ধর্মনিরপেক্ষ যা এক অর্থে ধর্মহীন। যে কোনও আধার বা মাধ্যমেই ইউরোপীয় রাজনীতিতে ধর্মের ঠাঁই নেই। এর আরেক সহজ অর্থ এই যে ইউরোপীয় সমাজে নৈতিকতার কোনও ভূমিকা নেই। তুমি যদি কাউকে ঠকাও আর ঠকিয়ে ধরা পড়, তুমি জেল খাটবে। আর ধরা না পড়লে তুমি চিটিংবাজী করেই বেমক্কা চালিয়ে যাবে। দীর্ঘদিন ধরে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করার যে পদ্ধতি তথাকথিত আমেরিকান অর্থনীতি বিশারদরা বরাবর চালিয়ে আসছেন তাতে তাদের হচ্ছে 'ঘণ্টা'। হ্যাঁ, যতক্ষণ না সরকার একান্তই মনস্থ করে যে তোমাকে শাস্তি দিতে হবে। হিসেব করে দেখা গেছে ১০ টার মধ্যে ৯টা কেসেই সরকার কিছুই করেনি। তুমি আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েই তোমার কোম্পানীর কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ ডলার কামিয়ে নিতে পার। সকলে সব জেনেও চুপ করে থাকবে। ব্যাপারটা এমন, যা হচ্ছে হোক। নাগরিক সংক্রান্ত বিষয়ে নৈতিকতার ধার কেউ ধারে না। আইনগুলি এমন ভাবে রয়েছে যাতে অনায়াসেই অসৎ ব্যক্তি আইনের চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে।

একজন ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ বলতে বোঝায়, যে ভগবানে বিশ্বাস করে না, আর ভগবান সম্বন্ধে তার কোনও ভয়ও নেই। এর মানে বোঝায় সেই মানুষটি এক নীতিহীন পরিবেশের মধ্যে কাজ করে চলেছে। যেখানে খেয়ালখুশী মতো যে কোনও কাজ করা যায়।

অতিথি কলম

জয় দুবাসী

এদের কাছে যেটা জরুরি তা হচ্ছে তোমাকে যুক্তিসঙ্গত মানুষ হতে হবে, হ্যাঁ তুমি শুধু যুক্তির কথাই শুনবে। তুমি কেবল সেই কাজটাই করবে যেটা যুক্তিগ্রাহ্য মনে হবে। যুক্তিগ্রাহ্য কার জন্য? বন্ধু, অবশ্যই তোমার জন্য। তোমার যদি ক্ষিদে পায় আর খাবার জোটাবার পয়সা না থাকে তুমি অনায়াসে অন্যের রুটি চুরি করে খেতে পার। এটা দোষের নয়— খুবই যুক্তিসঙ্গত কাজ নইলে তুমি টিকে থাকবে কি করে? আর টিকে থাকার থেকে বেশি যুক্তিগ্রাহ্য কাজ আর কিই বা হতে পারে? এই নিরিখেই পাশ্চাত্য সমাজ একটি অত্যন্ত যুক্তিনির্ভর সমাজ। এদের কাছে অ্যাটম বোম বানানো থেকে ৫ হাজার কিমি দূরের একটি দেশকে তার তৈল ভাণ্ডার গ্রাস করার জন্য আক্রমণ করা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার। কেননা এই কাজটি কর্মকর্তাকে ও তার সমাজকে বিপুল সাহায্য করবে। এক্ষেত্রে আক্রান্তের অবস্থা কি হবে বা যাদের ওপর বোমা ফেলা হলো সেই মানুষগুলি কি দুর্দশায় পড়বে এসব কোনও বিচার্য নয়।

ইতিহাস সাক্ষী :

মনে পড়ে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান হিরোসিমায় অ্যাটম বোমাটি ফেলার আগে দু'বার ভাবেননি এর ফল কি হবে। তিনি বলেছিলেন তাঁর আমেরিকান সৈন্যদের বাঁচাতে তিনি যা কিছু করতে প্রস্তুত। তাঁর ধারণা অনুযায়ী একজন আমেরিকান সৈন্যের জীবনের দাম ১ লক্ষ জাপানী নাগরিকের চেয়ে বেশি। এটি যে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত সমীকরণ তাতে সন্দেহ নেই। আর আমি এও নিশ্চিত তাঁর উপদেষ্টামণ্ডলীর লোকজন যাঁরা অবশ্যই যুক্তিনির্ভরও বটে তাঁরাও তাঁকে সমানভাবে সমর্থন দিয়েছিলেন। এখানে নৈতিকতার কোনও স্থান নেই। কেবলমাত্র যুক্তি— হ্যাঁ,

ঠাণ্ডা, খটখটে শুকনো যুক্তিই তোমার পক্ষে। তুমি যদি যুক্তিনিষ্ঠ হও তার মানেই তুমি ঠিক ও যথাযথ, কেননা তোমার কর্তব্যই হচ্ছে ঠাণ্ডা ও যুক্তিনিষ্ঠ থাকা। তুমি কখনই নৈতিকতার কথা ভাববে না তাহলেই তুমি বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে।

অন্যদিকে আমরা পূববাসীরা সঠিক অর্থে ভারতীয়রা এ ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত। আমরা সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই নৈতিকতাকে সামনে নিয়ে আসি তার ফলে আমাদের কার্যসিদ্ধির দিকটা তালগোল পাকিয়ে যায়। আমরা সবসময়ই কি করছি, কেন করছি আবার কিভাবে করছি এত শত ভেবেই ল্যাজেগোবরে। এমনও প্রায়ই দেখা যায় আমরা কেন এটা করছি ভেবে দাঁড়িয়ে গেছি। সেই 'কি', 'কেন', 'কেমন করে' ত্র্যহস্পর্শযোগ এই তিন প্রশ্নই রাস্তা আটকে দাঁড়ায়। পূর্বাপর এই তিন ভাবনা আসলে ন্যায়পরায়ণতা, সততা, সাধুতার প্রতিরূপ। এই তিন বস্তু কিন্তু শুনতে আলাদা লাগলেও আদতে অখণ্ড। আমরাই পৃথিবীতে একমাত্র মানব প্রজাতি নই। সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের চালিকাশক্তি হিসেবে যে সব প্রচলিত বিধি প্রকরণ আছে তা সকলের ক্ষেত্রেই সমান প্রযোজ্য। আমরা বিশ্বের সহযাত্রী হিসেবে এইসব বিধি বিধানকে মান্যতা দেওয়ারই পক্ষে। শুরুতে বলা ডমিনিক স্ট্রস খান আই এম এফ-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হওয়ার সুবাদে তাঁর একটা ধারণা জন্মেছিল যে সকাল ৯টা থেকে ৬টা পর্যন্ত তিনি এখানকার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তারপর তিনি মুক্তপুরুষ যা ইচ্ছে করতে পারেন। এই করতে পারার তালিকাটা তো সীমাহীন। তিনি মহিলাদের পেছনে ছুটে বেড়াতে পারেন, রাস্তার গেঁজেলদের সঙ্গে আড্ডা মারতে পারেন, আবার মন চাইলে খুনটুনও করে ফেলতে পারেন। অবশ্যই তাঁর সঙ্গে আই এম এফ-এর যে চুক্তিপত্র হয়েছিল তাঁর কোথাও তিনি এই কাজগুলো করতে পারবেন না এমনটা লেখা ছিল না। আই এম এফের অধিকর্তা হলে কি হবে, তাঁর মতে তিনি তো খণ্ডিত মানুষ। এই জন্যই ঝাড়া হাত পা। স্ট্রস-এর কোনও বিবেকের পিছুটান ছিল না, তাঁর মন যা পেয়েছে তিনি প্রাণ খুলে তা করেছেন। হ্যাঁ, তিনি তো একজন পাশ্চাত্যদেশীয়। নীতি, ভগবান— ভীতু ভারতীয় তো নন।

ইউরোপের সঙ্গে আমেরিকা জোড়া পাশ্চাত্য :

পিছিয়ে গেলে দেখা যাবে ভূতপূর্ব আমেরিকান রাষ্ট্রপতি ক্যাথলিক জন এফ কেনেডিও স্ট্রস খানের মতো এক গোয়ালেরই গোরু ছিলেন। যৌনতার প্রশ্নে তিনি স্ট্রসের চেয়েও বেশি কেতাদুরস্ত ও আগলহীন। এই প্রসঙ্গে কেনেডির ব্যক্তিগত গোয়েন্দা বাহিনী তাঁকে বারবার সতর্ক করেছিল। তারা কেনেডিকে চরিত্রহীন মেয়েদের সঙ্গে যথেচ্ছ মেলামেশা করতে বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি নিজের স্বভাব পাল্টাতে পারেননি। তাদের সতর্কবাণীকেও থোড়াই কেয়ার করতেন। এখানেই প্রশ্ন আসে যুক্তিযুক্ততার। আমার মনে হয় তাঁর দিক থেকে তিনি কোনও ভুল করেননি। তিনি ঠিক সেটাই করেছিলেন যাতে তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি আরও কাউকে কি আনন্দ দিয়েছিলেন? যেমন ধরুন তাঁর নিকটজন— স্ত্রী, পুত্র, মাতা বা পরিবারের কাউকে। না, তিনি শুধু আনন্দ দিয়েছিলেন নিজেকে। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলেন তাঁর আত্মপরিচয়। তিনি ছিলেন আমেরিকান রাষ্ট্রপতি যার চরিত্রের মধ্যে একটি সংহতি থাকা ছিল আবশ্যিক শর্ত। তিনি আমেরিকার মতো বৃহৎ দেশের খণ্ডিত সময়ের রাষ্ট্রপতি ছিলেন না। মনুষ্য সুলভ নানান সদ্‌গুণের সমাহার। তাঁর মধ্যে প্রত্যাশিত ছিল চারিত্রিক সংহতি। বিশ্বস্ত সূত্র অনুযায়ী যতদূর জানি তাঁকে অসংখ্যবার সতর্ক করা সত্ত্বেও যখন তিনি কু-অভ্যাস পাল্টালেন না তখন কোনও অসন্তুষ্ট গোষ্ঠীই তাঁকে নিকেশ করে দেয়। আমার এ ব্যাপারে তিলমাত্র সন্দেহ নেই যে, কেনেডিকে মেরেছিল তাঁর নিজের গুপ্তচর বিভাগের লোকেরা আর নয়তো তাঁর পরিবারের কেউ। এমন একজন নৈতিকভাবে অসৎ ও ইন্দ্রিয়বিলাসী মানুষকে তারা রাষ্ট্রপতি পদের পক্ষে অসম্মানজনক ও অযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। এই পরম্পরাটি স্ট্রস খানের ক্ষেত্রেও একইভাবে বহমান। তিনি অত্যন্ত ধুরন্ধর অর্থনীতিবিদ ও যোগ্য প্রশাসক হওয়া সত্ত্বেও ছিলেন নৈতিক বিশ্বস্ততাহীন ও একান্তভাবেই চারিত্রিক সংহতিহীন।

অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষীরা অবাক হয়ে বলবেন চারিত্রিক সংহতি আবার কি বস্তু? ব্যাপারটি স্বাভাবিক, কেননা তাদের পাঠক্রমে নৈতিক নামের কোনও বিশেষণের উল্লেখ নেই আর হয়তো চারিত্রিক সংহতিও অচেনা শব্দ। আর এই কারণেই তারা অনৈতিক, উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন করে চলেছেন। এ জীবনপ্রণালীর কোনও স্থির লক্ষ্য নেই— ঠিক তাদের চলতি অর্থনীতির মতো। হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে অর্থনৈতিক দুর্দশার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়ানো গ্রীসের প্রধানমন্ত্রী রোগ নির্ণয় করে বলেছেন, দেশের এমন দুরবস্থার মূল কারণ হচ্ছে মানুষের নৈতিক অধঃপতন। সেই চারিত্রিক সংহতির কথাই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। আসলে ভাল আর মন্দের তফাত করার মানদণ্ডটিই ইউরোপীয়রা হারিয়ে বসে আছে।

শেষ মূল্যায়ন :

শুভ-অশুভের চিহ্নিতকরণের ব্যর্থতায় ধ্বংস হয়েছিল রোম সাম্রাজ্য। আজ দু' হাজার বছর পর সেই একই ব্যাধিতে আক্রান্ত ইউরোপ ধ্বংসোন্মুখ। যখন কেউ নিজেকে নিয়ে লুকোছাপা করে সে নিজের বিবেকের কাছেও সৎ থাকে না। এরই প্রত্যক্ষ প্রতিফলন হয় তার সমাজে, অর্থনীতিতেও, সেখানেও যে লুকোছাপা করে, বেঁকা পথে চলে যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে সমাজে, ব্যক্তিজীবনে। কোনও দেশের জিডিপি ২০ শতাংশ হতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের যদি স্ট্রস খান বা জন এফ কেনেডির মতো নেতা জুটে যায় তাহলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। জিডিপির বর্ধিত হার তো স্বর্গ থেকে পড়ে না। দেশের মানুষের কঠিন পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে জিডিপি-র সমৃদ্ধি হয়। আর শ্রমের সুফসল তখনই তোলা যায় যখন কেউ নিশ্চিত থাকে সে ভাল কাজ করছে না মন্দ কাজ করছে। আমি নিশ্চিত নৈতিক সততার ওপরই প্রত্যেকটি কাজ ও তা থেকে ফল পাওয়া নির্ভর করে। সেদিক থেকে দেখলে কর্মের সঙ্গে কর্মফল অবশ্যই নৈতিকতার অবিচ্ছেদ্য ভিত্তিভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেই কারণেই যে সমাজে সুরেশ কালমাদী, এ. রাজা, শরদ পাওয়ার বা মায়াবতীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে সে সমাজ নৈরাশ্যে নিমজ্জমান, পরিত্রাণহীন। একটু ভাবলেই দেখা যায় নৈতিক সংহতির অভাব আর দুর্নীতির মধ্যে দূরত্ব খুবই কম। আবার দুর্নীতি ও ধ্বংসের পারস্পরিক দূরত্ব তার থেকেও কম। ▯

(লেখক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও স্তম্ভলেখক)

সর্বনাশের পদধ্বনি

নটরাজ ভারতী

“ইসলামী শাসনের নামে এক চূড়ান্ত বর্বরতাকে ফিরিয়ে আনার কু-চেষ্টা শুরু হয়েছে। চারপাশের সব দেখে শুনেও চুপ রাজনীতির দালালরা। আর তাদের হাতের পুতুল প্রশাসকরা। কিন্তু যে সর্বনাশ ধেয়ে আসছে তা ভয়ঙ্কর। এখনই সজাগ হতে হবে। ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। নয়তো এ বর্বরতা আমাদের কাউকেই ছাড়বে না।”

ঘুঙুর নয়। সর্বনাশের ঢাক বাজছে কানের কাছে। আমরা শুনছি। আমাদের প্রতিবাদে গর্জে ওঠার কথা। আমরা কিন্তু করছি না। আফগানিস্তানের সীমা অতিক্রম করে ভয়ঙ্কর তালিবানি শাসন এখন ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছে। কখনও-সখনও তার ছিঁটেফোঁটা কানে আসছে। সেটুকুই যথেষ্ট। যেসব গ্রামে মুসলমানের সংখ্যা বেশি সেগুলিতে ইসলামিক শাসন প্রবর্তনের প্রাণপণ চেষ্টা চলছে। নিজেরাই কোরাণ হাদিস অনুসারে বিচার করছে। তারাই শাস্তি দিচ্ছে। ভারতীয় প্রশাসন ও আইনকে কাঁচকলা দেখাচ্ছে তারা। মিডিয়ায় খবর হচ্ছে। তালিবানি ফতোয়া। কিন্তু এর ভয়ঙ্কর পরিণতি আমাদের রাস্তায় নামতে বাধ্য করছে না। তাবড় প্রতিবাদী বুদ্ধিজীবীরাও একেবারে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। মুসলমানদের চরম অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সাহস এদেশের কোনও বুদ্ধিজীবীর নেই। হয় দেশছাড়া হতে হবে, না হয় গর্দান যাবে। গ্রামেগঞ্জে এই তালিবানি শাসন এই প্রথম নয়। এতদিন লুকিয়ে-চুরিয়ে চলতো এখন তা প্রকাশ্যে আসছে। সারা ভারতে ইসলামী শাসন প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন শুরু করার জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে জোর কদমে।

বছর বারো আগের কথা। তখন একটি প্রতিষ্ঠিত দৈনিক পত্রিকায় সাংবাদিকতা করি। একদিন ভোরবেলায় খবর পেলাম নদীতীরের এক প্রত্যন্ত গ্রামে এক চোর ধরা পড়েছে। ইসলামী মতে তার বিচার চলছে। ছুটলাম সেই গ্রামে। গিয়ে দেখলাম বিচার শেষ। শাস্তিও শেষ। গ্রামের মসজিদের সামনে রক্তে মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে এক তাজা যুবক। দুটি হাত কনুই থেকে কাটা। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে আমার সঙ্গী সাংবাদিক অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন মোবাইল ছিল না। কোনওক্রমে গ্রামের বাইরে এসে গাছের নিচে বসলাম। ভয়ঙ্কর আতঙ্ক নিয়ে ফিরলাম। যে কাগজে কাজ করতাম সেখানে রিপোর্ট পাঠালাম। ভিতরের পাতায় বেরিয়েছিল। সে মামলা এখনও আদালতের বিচারাধীন। সব অপরাধীই জামিনে মুক্ত হয়ে আছে। সেই প্রথম দেখি ইসলামের ভয়ঙ্কর আইন।

বছর তিনেক আগে মুর্শিদাবাদের এক প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে একটি ফোন পাই। অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে সেই বৃদ্ধ জানান আমার মেয়েকে উদ্ধার করুন। ফোন এসেছিল রাতে। পুলিশকে খবর দিয়ে গ্রামে পৌঁছাতে সকাল হয়ে যায়। পুলিশ এসে এক গণ্ডগ্রাম থেকে উদ্ধার করে ৩০ বছরের উলঙ্গ ওই মহিলাকে। ঘটনা হলো ওই মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামে থাকতেন এক মুসলিম দম্পতি। ছেলেপুলে হয়নি। অত্যন্ত দরিদ্র। কাজের জন্য পুরুষটি মাঝে মাঝেই বাড়ি ফিরত না। সেদিনও ফেরেনি। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় তার পিসিমার ছেলে বাড়ির কিছু চালডাল নিয়ে দিতে এসেছিল। গ্রামের লোকেরা ভাবে স্বামী না থাকার সুবাদে পরপুরুষ ঢুকিয়েছে ঘরে। অতএব রাত নটা নাগাদ তার ভাঙা মাটির বাড়ি ঘিরে ধরে দুজনকে বার করা হয়। সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে দুজনকে রাত সাড়ে নটায় গ্রামের একটি ইলেকট্রিক পোলে বাধা হয়। ছেলেটিকে মারধোর দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। মেয়েটির বিচার করেন মৌলবী সাহেব। সেই বিচার অনুসারে মেয়েটির মাথার চুল কেটে দেওয়া হয়। তারপর সারারাত ধরে গ্রামের সমস্ত সক্ষম পুরুষ একে একে ধর্ষণ করে ওই মহিলাকে। মেয়েটি জানায় ৫৫ বছরের বৃদ্ধ থেকে পনের বছরের কিশোর যার যখন ইচ্ছা হয়েছে সে তখন ধর্ষণ করেছে। মেয়েটির বাবার বাড়ির লোক খবর পাওয়ার পর উদ্ধারের চেষ্টা করেছিল। পারেনি। তাই শেষে আমাকে ফোন করে। মেয়েটি জানায় এই শাস্তির ‘শুভসূচনা’ করেছিল ওই গ্রামের মৌলভী সাহেব। ইসলামী আইনের এ আর এক নমুনা। সেদিনও সংবাদ করেছিলাম।

এহেন ইসলামী শাসন সারা ভারতে চালুর দাবিতে আগামীদিনে আন্দোলনে নামবে মুসলমানরা— ভারতের তথাকথিত পণ্ডিত ও বিজ্ঞ মুসলমানরা। তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন ভাবে। এই মুহূর্তে ভারতের অন্যতম পণ্ডিত জাকির নায়েক। সেই জাকির নায়েকের একটি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে কলকাতার তালিম প্রকাশনী থেকে। গ্রন্থটির নাম ‘ইসলাম সম্পর্কে হিন্দুদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত কিছু বিষয়।’ এই গ্রন্থের ৩৩ পাতায় যা লেখা হয়েছে তা শুধু সর্বনাশ নয় রীতিমতো ভয়ঙ্কর। শুধু মুসলমান নয় হিন্দুদেরকেও মেনে চলতে হবে ইসলামী আইন।

ওই পুস্তিকায় লেখা হয়েছে— “আমরা, মুসলিমরা চাইব। এবং এই বিষয়টার উপরই অগ্রাধিকার দেব যে— যেন সমগ্র ভারতবাসীর উপরই ‘ইসলামী ফৌজদারী আইন’ সমানভাবে প্রযোজ্য হয়। এরই সুপরিণতিতে নিশ্চিত ভাবে বলা যায়— চোরের বা ছিনতাইকারীর হাত কাটা গেলে অবশ্য-অবশ্যই ভারতে ছিনতাইয়ের হার চুরির হার হ্রাস পাবে। ঠিক একই ভাবে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের শাস্তি হিসাবে ৮০ বেত্রাঘাত কার্যকরী করা হলে এই শাস্তি হবে অন্যের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ এবং একজন মানুষকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া থেকে দূরে রাখবে। তিনি আরও বলেছেন ইসলামী ফৌজদারী আইন-ই সর্বাধিক বাস্তবোচিত- প্যাক্টিকাল। ভারতে অপরাধ অপকর্মের যদি একটা হেস্তনেস্ত করতেই হয়, যদি হ্রাস করতে হয় অবিচারকে বা বন্ধ করতেই হয় পক্ষপাতিত্বকে তবে সর্বোত্তম সমাধান হচ্ছে— ‘The Common Islamic crimi-

nal Law বা সাধারণ ইসলামী ফৌজদারী আইনগুলোকে অনতিবিলম্বে কার্যকরী করা, তার প্রয়োগ ঘটানো।'

জাকির নায়েক এই মুহূর্তে ইসলামী দুনিয়ার অবিসংবাদী পণ্ডিত। পৃথিবীতে ইসলামী অনুশাসন প্রচলনের অনেক দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে নিয়েছেন। তার নানা আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে ইসলামী দুনিয়া। ভারতে ইসলামী ফৌজদারী আইন চালু করার নানা প্রচেষ্টাও নানা সময় দেখা যাচ্ছে। সে পশ্চিমবঙ্গই হোক আর উত্তরপ্রদেশেই হোক। আর তাতেই সর্বনাশের সূচনা। দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনায় সরব হচ্ছে মিডিয়া। বেশিরভাগই থেকে যাচ্ছ অজানা। মুসলমান এলাকায় 'মিডিয়া' ঢুকতেও রীতিমতো ভয় পায়।

ভারতে এখন মুসলমানের সংখ্যা প্রায় কুড়ি কোটি। হিন্দুর সংখ্যা প্রায় ১০০ কোটি। তাতেই এই অবস্থা। অজকুলোদ্ভব রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর মদত ছাড়া এ কখনওই সম্ভব হোত না। সঙ্গে আছে একদল নির্বোধ বুদ্ধিজীবী। এরা না বোঝে ইসলাম, না বোঝে ইসলামী শাসন। তালিবানরাই যে ইসলামের আসল সৈনিক, তাও বোঝে না। এদের ধারণা ইসলাম অত্যন্ত উদার ও মহৎ। ইসলাম আর তালিবান যে সমার্থক সেই সত্যটা এরা বুঝেও বোঝে না।

ইসলামী শাসনের ভয়ঙ্কর সব ছবি ইন্টারনেটে সহজলভ্য। প্রকাশ্যে কারও মাথা কেটে দেওয়া হচ্ছে, কাউকে প্রকাশ্যে ধর্ষণ, কাউকে কোমর পর্যন্ত পুঁতে ঢিল ছুঁড়ে মারা হচ্ছে। ভারতের ইসলামী পণ্ডিতদের মতে ভারতে ইসলামী শাসন চালু করলে ভারতে অপরাধের সংখ্যা অনেক কমে যাবে। ভারতে শান্তি আসবে। এইসব পণ্ডিত প্রবর গবেটদের অত্যন্ত বিনীত ভাবে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে তাহলে ১৬০০ বছর ধরে আরবে আল্লার শাসন থাকা সত্ত্বেও সেখানে শান্তি নেই কেন? শুধুমাত্র ২০১২ সালেই এখনও পর্যন্ত নানা অপরাধে ৭৬ জনের প্রকাশ্যে মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়েছে শুধু আরবে। আশেপাশের ছোটখাটো মুসলিম দেশগুলি ধরলে সংখ্যাটা আরও বেশি। অর্ধেক মাটিতে পুঁতে ঢিল ছুঁড়ে মারা হয়েছে বহু মহিলাকে। প্রকাশ্যে গুলি করে নারীহত্যার ঘটনা হামেশাই দেখা যায়। স্বয়ং খোদাতালার নিজের দেশগুলিতেই এত অশান্তি এত অপরাধ কেন। আল্লা সেখানে নিজের খাসতালুক সামলাতেই চূড়ান্ত ব্যর্থ সেখানে তিনি ভারত সামলাবেন এ ভরসা করি কেন।

ইসলামী শাসনের নামে এক চূড়ান্ত বর্বরতাকে ফিরিয়ে আনার কু-চেষ্টা শুরু হয়েছে। চারপাশের সব দেখে শুনেও চুপ রাজনীতির দালালরা। আর তাদের হাতের পুতুল প্রশাসকরা। কিন্তু যে সর্বনাশ ধেয়ে আসছে তা ভয়ঙ্কর। এখনই সজাগ হতে হবে। ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। নয়তো এ বর্বরতা আমাদের কাউকেই ছাড়বে না। □

পায়ে পায়ে পঁয়ষট্টি

রোহিনী প্রসাদ প্রামাণিক

স্বাধীনতার নামে ভারত সদ্য বিভক্ত। নেহরু শাসনতন্ত্র দেশ ও জাতীয় স্বাভিমান সম্পর্কে স্পষ্ট বোধশূন্য। ঠিক সেই সময় জাতীয়তাবাদী কণ্ঠস্বরের একটা বাণীরূপ দেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়। সেই ঐতিহাসিক চিন্তার ফসল সাপ্তাহিক স্বস্তিকা। স্বস্তিকা প্রকাশে সেদিন যেক'টি তরুণ ও অনভিজ্ঞ কর্মী উদ্যোগী হয়েছিলেন তাঁরা নিমিত্ত মাত্র। এর পিছনে ছিল একটা নির্দিষ্ট সাংগঠনিক চিন্তাধারার প্রেরণা ও পরিকল্পনা।

১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর (২১ ভাদ্র, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ) শুভ জন্মাষ্টমী তিথিতে স্বস্তিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার আত্মপ্রকাশ। তারপর অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে স্বস্তিকা গত ৬৪ বছর ধরে রাষ্ট্র জাগরণের কাজ করে চলেছে।

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ। পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দু নিধন ও নির্যাতন চরমে উঠেছে। উদ্বাস্তুরা দলে দলে এসে আছড়ে পড়ছে। নানা প্রতিষ্ঠানের সেবাকাজ চলছে শিয়ালদা স্টেশনে। নানা পরিবার, নানা মানুষের নির্যাতন ও লাঞ্ছনার তাজা খবর দিয়েছে স্বস্তিকা। ১৯৫০ সালের ১৬ মার্চ ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে একটি পত্র লিখলেন—

"I gave a note to Amal Home today to be shown to some news paper editors. I asked him to give you a copy. I feel that Calcutta papers are responsible for a great deal of mischeif and this must be brought home to them. They are very irresponsible with fire. Among the worst papers the RSS Swastika, Jugantar, Basumati and Amrita Bazar Partrika." (স্বস্তিকা, ১১ এপ্রিল, ২০১১, ৬০ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা) অর্থাৎ জন্মলগ্নেই সরকারি রোষানলে স্বস্তিকা। তবে অমৃতবাজার, যুগান্তর, বসুমতীর মতো সেইসময়কার সংবাদপত্র জগতের বিশিষ্ট পত্রিকাগুলির সঙ্গে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু নবাগত স্বস্তিকাকে একাসনে বসিয়ে যে কৌলীন্য দান করেছেন তাতে অবশ্য তাঁর ধন্যবাদই প্রাপ্য!

স্বস্তিকা প্রকাশের দুই বছরের মধ্যে ব্যারিস্টার রণদেব চৌধুরী, একনাথ রানাডে, অধ্যক্ষ কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী, অধ্যাপক অমল কুমার বসু-কে নিয়ে স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট গঠিত হয় যা স্বস্তিকার তৃতীয় বর্ষ নবম সংখ্যায় (ডিসেম্বর ১৯৫০) প্রকাশিত হয়েছে।

ইতিমধ্যে ঘটনা পরম্পরায় অনেকগুলি পরিবর্তন স্বস্তিকা প্রকাশনার ক্ষেত্রে ঘটে গেল। অমল কুমার বসু তখন ট্রাস্টের সম্পাদক। ১৯৫৫ সালে সেপ্টেম্বরে সনৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন স্বস্তিকার সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রক। কার্যকরী সম্পাদকের দায়িত্বে রইলেন ভবেন্দু ভট্টাচার্য। এই সময় থেকে অসীম কুমার মিত্র সম্পাদনার ক্ষেত্রে সহায়তা করেন। পরবর্তীকালে তিনি ও ভবেন্দু ভট্টাচার্য যথাক্রমে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য, স্বস্তিকার প্রথম সম্পাদক হেমেন্দ্রনাথ পণ্ডিত। দ্বিতীয় সম্পাদক ভৈরবচন্দ্র ভট্টাচার্য (আগস্ট ১৯৪৯)। তৃতীয় সম্পাদক অনিল ভট্টাচার্য (১৫ মার্চ ১৯৫৩)। এই ১৯৫৩ থেকে স্বস্তিকার ঠিকানা— ২৭/১বি, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, এখন যা বিধান সরণি। স্বস্তিকার প্রথম প্রকাশক রবীন্দ্রনাথ হোড়—১১০/১ আমহার্স্ট স্ট্রিট। বর্তমান প্রকাশক তথা স্বস্তিকা প্রকাশন ট্রাস্টের সম্পাদক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ২০০৮ সাল থেকে স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষ থেকে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের স্বদেশ ও সমাজ সম্পর্কে স্বাভিমান সম্পন্ন বিদ্যার্থীদের জন্য বার্ষিক ছাত্রবৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তথা স্বস্তিকার অগ্রগতির ক্ষেত্রে আমেরিকা প্রবাসী নৃপেন্দ্রপ্রসন্ন আচার্য-এর নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়।

১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ নাগাদ পাকিস্তানে একপ্রস্থ হিন্দু নিধন শুরু হলে স্বস্তিকা যে অগ্নিবর্ষী প্রতিবাদ জানায়, তারই ফলে ডি আই রুলে ৬৪-র এপ্রিলের প্রথমেই সম্পাদক সনৎ কুমার ব্যানার্জীকে গ্রেপ্তার করা হয়। 'যুগবাণী' সম্পাদক দেবজ্যোতি বর্মণ ও 'অচলপত্র' সম্পাদক দীপ্তেন্দ্র সান্যাল-এর মতো সাংবাদিক ও জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবী মহলের সক্রিয়তায় তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং ১২ জুন স্বস্তিকা সম্পাদক মুক্তি পান।

১৯৭৫-৭৭-এ জরুরি অবস্থার সময় কংগ্রেসের সিদ্ধার্থ রায় সরকার দারুণ চাপ সৃষ্টি করলেও স্বস্তিকার প্রকাশ বন্ধ করতে পারেনি।

স্বস্তিকার উপর বামফ্রন্ট সরকারও প্রচণ্ড আঘাত হানার চেষ্টা করে। ১৯৯২ সালে ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যায় রামজন্মভূমিস্থিত কাঠামো ধূলিসাৎ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ১১ ডিসেম্বর স্বস্তিকা সম্পাদকীয় দপ্তর বামফ্রন্ট সরকার সীল করে দেয় এবং স্বস্তিকা কার্যালয়ে সশস্ত্র পুলিশ পাহারা বসিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু স্বস্তিকা কর্মীদের দৃঢ়তা সব প্রতিবন্ধকতা ব্যর্থ করে দেয়। একটি সংখ্যার প্রকাশও বন্ধ হয়নি। পর পর সব সংখ্যা বাইরে থেকে প্রকাশিত হয়। এমনকী আদালতের নির্দেশে বামফ্রন্ট সরকার স্বস্তিকা সম্পাদকীয় দপ্তরের তালা খুলে দিতে বাধ্য হয়।

সম্প্রতি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মুসলিম তোষণের বিরুদ্ধে এবং দেগঙ্গায় পূজামণ্ডপে মুসলিম দুষ্কৃতীদের হামলার প্রতিবাদে স্বস্তিকায় 'সোজাসাপ্টা' বিভাগে যে ধারাবাহিক রচনা প্রকাশিত হয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে ফোনে হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়।

বস্তুত স্বস্তিকা প্রথমাবধিই পাক-তোষণ নীতির বিরুদ্ধে, হায়দরাবাদ-কাশ্মীর-পূর্ব-পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে হিন্দুনিধন ও হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। জাতির শ্রদ্ধাবিন্দুগুলির মর্যাদা রক্ষায়, যেমন গোরক্ষা ও রামজন্মভূমি আন্দোলনের সমর্থনে সোচ্চার হয়েছে। দেশের অখণ্ডতা ও ঐক্য রক্ষায় ৩৭০ ধারা বিলোপের দাবী, বাংলাদেশী মুসলিমদের অনুপ্রবেশ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভারত দখলের অপচেষ্টা, কাশ্মীর, অসম, পাঞ্জাবসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ও সন্ত্রাস, কমিউনিস্ট ও বিদেশি খৃস্টান মিশনারীদের দেশবিরোধী কাজকর্ম, মেকি-ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের ক্ষমতালিপ্সার বিরুদ্ধে স্বস্তিকার প্রতিবাদ সাড়া জাগিয়েছে। বর্তমানে স্বস্তিকার সম্পাদকীয় বিভাগের এই কর্মযজ্ঞে লেখক সাংবাদিক-গোষ্ঠীর সংখ্যা একশো-র কাছাকাছি।

বাংলার পত্রিকা জগতের ঐতিহ্য অনুসারে স্বস্তিকা ১৯৫১ সাল থেকে পূজাসংখ্যা প্রকাশ করে আসছে যাতে লিখেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, গজেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ভবেন্দু ভট্টাচার্য, অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, হরপ্রসাদ মিত্র, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, নবকুমার বসু, রমানাথ রায়, শেখর বসু, এষা দে, দীপক চন্দ্র, গোপালকৃষ্ণ রায়, চণ্ডী লাহিড়ী, হিমানীশ গোস্বামী, আদিত্য সেনগুপ্ত, মানবেন্দ্র পাল, অদ্রীশ বর্ধন প্রমুখের মতো বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখকরা। প্রবন্ধ সাহিত্যে সমৃদ্ধ করেছেন পবিত্রকুমার ঘোষ, সন্তোষ কুমার ঘোষ, নিমাই সাধন বসু, সীতানাথ গোস্বামী, কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী, কালিদাস বসু, বঙ্কুবিহারী চক্রবর্তী, রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, তথাগত রায়, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, প্রণব রায়, দীনেশচন্দ্র সিংহ, নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত, কে কে গাঙ্গুলী, সব্যসাচী বাগচী, দেবীপ্রসাদ রায়, দেবানন্দ ব্রহ্মচারী, নবকুমার ভট্টাচার্য প্রমুখ। সংবাদ প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে রঞ্জিত রায়, অসীমকুমার মিত্র, নিশাকর সোম, শিবাজী গুপ্ত, বিশাখা (প্রেমোৎপল) বিশ্বাস, দুর্গাপদ ঘোষ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। অলঙ্করণ ও চিত্রসম্ভারে সমৃদ্ধ করেছেন শিল্পী অন্নদা মুন্সী, রঘুনাথ গোস্বামী, সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

১৯৫৩ সালের ২৩ জুন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর কাশ্মীরে আত্মবলিদানের পরের বছর থেকে 'শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা' এযাবৎ প্রতিবছর প্রকাশিত হয়ে আসছে। পূজা সংখ্যার পর দীপাবলী সংখ্যা, বঙ্গাব্দের শুভারম্ভে নববর্ষ সংখ্যা, ১৫ আগস্ট এবং প্রজাতন্ত্র উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

বিষয় নির্বাচনের পাশাপাশি স্বস্তিকার বহিরঙ্গ--- অলংকরণ ও রূপায়ণের ক্রমবিকাশটিও লক্ষণীয়। স্বস্তিকা শুরুর সময় ছিল 'ক্রাউন সাইজ'-এর ৮ পাতার কাগজ। ছাপা হোত লেটার প্রেসে। ব্লক নির্ভর ছবি। কয়েক বছর পর পৃষ্ঠা সংখ্যা বেড়ে হয় ১২। এভাবে বেশকিছু বছর চলার পর ১৯৯২ সালের ৬ জানুয়ারি সংখ্যা থেকে স্বস্তিকা অফসেটে ছাপা হতে শুরু করে। স্বস্তিকায় শুরু হয় 'কম্পিউটার'-এর যুগ (১৯৯১)। পৃষ্ঠা সংখ্যা বেড়ে হয় ১৬। মাঝেমধ্যে স্বস্তিকা রঙীন আকারে প্রকাশিত হলেও নিয়মিতভাবে প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠাটি (১ এবং ১৬) রঙীন হয়ে প্রকাশিত হতে শুরু করে রথযাত্রা থেকে— ১৪.৭.২০০৮ (৬০ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা) সংখ্যা থেকে। এইভাবে কয়েকবছর চলার পর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ১৭৫তম জন্মবর্ষ উপলক্ষে নববর্ষ সংখ্যা গত ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, ৪ বৈশাখ, ইংরাজী ১৮ এপ্রিল, ২০১১ (৬৩ বর্ষ ৩১ সংখ্যা) থেকে গ্রন্থাকারে (Magazine Size) প্রকাশিত হতে শুরু করে। প্রচ্ছদসহ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬। স্বস্তিকা-র ওয়েবসাইট শুরু হয় ২৫ আগস্ট ২০০৩, ৫৬ বর্ষ ১ম সংখ্যা, (৮ ভাদ্র, ১৪১০)। www.eswastika.com এবং ই-মেল vijoy.adya@gmail.com. স্বস্তিকা ওয়েবসাইট-এ প্রকাশের ক্ষেত্রে আমেরিকা প্রবাসী শ্রীকান্ত মুখার্জীর অবদান স্বীকার করতেই হয়। বর্তমান সম্পাদক--- ডঃ বিজয় আঢ্য, সহ-সম্পাদক— বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। রূপায়ণে— অজিত ভকত এবং ব্যবস্থাপনায় অভিজিৎ রায়চৌধুরী।

পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা এবং দেশের বিভিন্ন বঙ্গভাষী অঞ্চলে স্বস্তিকা ২০ হাজারেরও বেশি সংখ্যায় প্রচারিত ও প্রসারিত হয়ে থাকে।

স্বস্তিকার 'চিঠিপত্র' বিভাগে স্বস্তিকা সম্পর্কে পাঠক তথা সমাজের যে মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ—

 "আপনাদের প্রচার কম। কিন্তু কণ্ঠ বলিষ্ঠ ও আবেদন হৃদয়গ্রাহী। ...আপনাদের কাগজের বেশ কিছু লেখক আমাদের চোখ খুলে দেওয়ার মতো লেখা লিখে চলেছেন।" (৬৩ বর্ষ ১ম সংখ্যা ৬.৯.১০)

 "সঠিক সংবাদটি (দেগঙ্গায় হিন্দুদের উপর মুসলিম দুষ্কৃতীদের হামলা) একমাত্র পরিবেশিত হলো স্বস্তিকা পত্রিকার বলিষ্ঠ পদক্ষেপের দ্বারা। এই ঘটনাটিই প্রমাণ করল যে, ভারতের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিন্দুত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য স্বস্তিকা সাপ্তাহিকটি প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। (৬৩ বর্ষ ৭ম সংখ্যা— ১.১১.১০)

 "আমি স্বস্তিকা'র দীর্ঘদিনের পাঠক, বিগত কয়েকটি সংখ্যায় দেখছি স্বস্তিকাকে দৈনিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশ করার জন্য পাঠকদের আকুল আবেদন। প্রত্যেক দেশপ্রেমী বঙ্গবাসীরই আজকের উপলব্ধি— একটা জাতীয়তাবাদী দৈনিক পত্রিকা চাই।" (৬২ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা— ১৩.১.২০১১)

বিশ শতকের নয়-এর দশকে স্বস্তিকা একটু মোড় ফিরতে শুরু করে। শুরু হয় অফসেটে ছাপা। মাঝেমধ্যে রঙীন প্রকাশনা। গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান। স্বস্তিকা-কে কেন্দ্র করে নানা অনুষ্ঠান।

স্বস্তিকা-র প্রবীণ সম্পাদক ভবেন্দু ভট্টাচার্যকে সংবর্ধনা জানানো হয় ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৩, শনিবার, সকাল ৯-৩০ মিনিটে কলকাতায় মহাজাতি সদনের সভাঘরে আয়োজিত এক সভায়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সাংবাদিক পবিত্র কুমার ঘোষ। সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে ভবেন্দু ভট্টাচার্যের বিভিন্ন ধরনের রচনার একটি নির্বাচিত সংকলন রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিজয় আঢ্য-এর সম্পাদনায় প্রকাশ করা হয়। কালিদাস বসু, মনোজ ঘোষ প্রমুখ ছিলেন এই কার্যক্রমের উদ্যোক্তা।

স্বস্তিকার ৫০ বছর উপলক্ষে ২৪ আগস্ট, ১৯৯৭, সকাল ১০টায় কলকাতার মহাজাতি সদনের সভাঘরে এক সভার আয়োজন করা হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ এইচ ভি শেষাদ্রি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্বস্তিকার দুই প্রাক্তন সম্পাদক ভৈরবচন্দ্র ভট্টাচার্য ও অনিল ভট্টাচার্যকে সংবর্ধনা জানানো হয়। স্বস্তিকা সুবর্ণ জয়ন্তী সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ডঃ সীতানাথ গোস্বামী সভাপতিত্ব করেন। এই সময়ই (২৪-২৫ আগস্ট, ১৯৯৭) সঙ্ঘের প্রচারক তথা স্বস্তিকার মুখ্য ব্যবস্থাপক সুধাময় দত্তের পরিচালনায় দুদিনের একটি এজেন্ট (প্রচার প্রতিনিধি) সম্মেলন মাহেশ্বরী সেবাসদন (ধর্মশালা)-এ অনুষ্ঠিত হয়। স্বস্তিকার ইতিহাসে এই ধরনের এজেন্ট সম্মেলন এই প্রথম। শুরু হয় স্বস্তিকার গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান।

এই বছরের ১৮ এপ্রিল, ১৯৯৮, শনিবার, বিকাল ৫টায় স্বস্তিকার নববর্ষ সংখ্যার উন্মোচন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় কলকাতার 'কিশোর ভবনে'। অধ্যাপক বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী এই সংখ্যাটির উন্মোচন করেন। বিশিষ্ট শিল্পপতি দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

২২ আগস্ট, ১৯৯৮, শনিবার বিকাল ৫-৩০ মি. কলকাতা মহাজাতি সদনের সভাঘরে আয়োজিত হয় স্বস্তিকার ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য নিমাই সাধন বসু। উল্লেখ্য, সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে স্বস্তিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় সংরক্ষণের জন্য আর্কাইভ (Archive) গড়ে তোলা হয় যা দিনে দিনে সমৃদ্ধ হচ্ছে। স্বস্তিকার গ্রন্থাগার বিভাগটি শ্রী পীতারুণ মুখোপাধ্যায়-এর সহায়তায় নতুন করে সাজানো হচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীর সূচনায় ২০০১ (১৬.৪.২০০১/১৪০৮ বঙ্গাব্দ/৫৩ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা)-এর নববর্ষ সংখ্যাটির উন্মোচন করেন সঙ্ঘের তৎকালীন সরকার্যবাহ মোহনরাও ভাগবত। মহাজাতি সদনের অ্যানেক্স হলে অনুষ্ঠানটি হয়। মঞ্চে ছিলেন জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী, অসীমকুমার মিত্র, সাংবাদিক মুজফফর হুসেন প্রমুখ। ২১ এপ্রিল ২০০৫, বৃহস্পতিবার, বিকাল ৫টায় কলকাতায় কেশব ভবনে আয়োজিত সভায় স্বস্তিকার নববর্ষ সংখ্যার উন্মোচন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক কে এস সুদর্শন। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কলকাতা প্রেস-এর তৎপরতা ছিল লক্ষণীয়।

১৭ এপ্রিল, ২০০৬, সোমবার বিকাল ৫টায় কলকাতার 'কেশব ভবন'-এ আয়োজিত এক সভায় স্বস্তিকা নববর্ষ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করেন ওড়িশা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রী সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি ছিলেন সাহিত্যিক শ্রী রমানাথ রায়। প্রধান বক্তা সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী।

ইতিমধ্যে স্বস্তিকার দুই সম্পাদক সনৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভবেন্দু ভট্টাচার্য পরলোক গমন করেন। তাদের স্মরণে আয়োজিত শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় বহু বিশিষ্ট মানুষ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

২০০৮ সালের ১২ এপ্রিল, শনিবার, বিকাল ৫ টায় মহাজাতি সদনের সভাঘরে স্বস্তিকার ৬০ বর্ষ উপলক্ষে নববর্ষ সংখ্যার উন্মোচন অনুষ্ঠান হয়। এই সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক কে এস সুদর্শন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সুবীর ভৌমিক। সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ স্টেট আর্কাইভ-এর অবসরপ্রাপ্ত অধিকর্তা ডঃ প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়। 'পাঞ্চজন্য' পত্রিকার সম্পাদক তরুণ বিজয় এই অনুষ্ঠানের অন্যতম বক্তা ছিলেন। মঞ্চে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণরাও মোতলগ, কালিদাস বসু, যুগলকিশোর জৈথলিয়া, কেশবরাও দীক্ষিত, অমল কুমার বসু ও রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাগত ভাষণ দেন। এই অনুষ্ঠানে টেলিগ্রাফ তথা স্বস্তিকার প্রবীণ সাংবাদিক এবং কলকাতা প্রেসক্লাবের প্রাক্তন সম্পাদক রঞ্জিত রায়-কে সংবর্ধনা জানানো হয়। যিনি গূঢ়পুরুষ নামে দীর্ঘদিন স্বস্তিকায় লিখে আসছেন। স্বস্তিকার পাঠকবর্গের কাছে শিবাজী গুপ্ত নামে পরিচিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ডেপুটি রেজিস্টার ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ এবং বিশিষ্ট স্তম্ভলেখক অধ্যাপক ডঃ নির্মলেন্দুবিকাশ রক্ষিতকেও সংবর্ধনা জানানো হয়। কলকাতায় কেশব ভবনে আয়োজিত ২০১০-এর ১১ এপ্রিল স্বস্তিকার নববর্ষ সংখ্যা (হিন্দুত্ব সংখ্যা)-র আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করেন সঙ্ঘের প্রাক্তন সর্বভারতীয় বৌদ্ধিক প্রমুখ মধুভাই কুলকার্নী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক অম্বর মুখোপাধ্যায়। সভাপতিত্ব করেন 'তত্ত্বমসি' পত্রিকার সম্পাদক তথা ব্যারাকপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মিশন-এর সন্ন্যাসী স্বামী বেদানন্দ। ২০১১-র ১৪ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা ৬ টায় কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরী হল-এ স্বস্তিকার নববর্ষ সংখ্যার উন্মোচন করেন সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ সুরেশ সোনী। সভাপতিত্ব করেন কবি ও সাহিত্যিক আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা 'পাঞ্চজন্য' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক শ্রী তরুণ বিজয়। এই সংখ্যা থেকে স্বস্তিকা নব আঙ্গিকে অর্থাৎ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হতে থাকে।

২০১১-র স্বস্তিকা ভবনে একটি ঘরোয়া লেখক সম্মেলন হয়। প্রায় চল্লিশ জন লেখক-সাংবাদিক সেদিন উপস্থিত ছিলেন। পূজাসংখ্যার উন্মোচন করেন ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ। মঞ্চে ছিলেন নৃপেন্দ্রপ্রসন্ন আচার্য ও রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০১২-র ১৩ এপ্রিল, শনিবার, বিকেল ৫টায়, কলকাতায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অন্যতম সহ-সরকার্যবাহ কৃষ্ণগোপাল শর্মা স্বস্তিকার নববর্ষ সংখ্যার উন্মোচন করেন। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন ইংরাজি দৈনিক 'স্টেটসম্যান'-এর প্রবীণ সাংবাদিক তরুণ গোস্বামী। সভাপতিত্ব করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন বাংলাবিভাগের প্রধান ডঃ অচিন্ত্য বিশ্বাস। সভাগৃহ ছিল পরিপূর্ণ।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে সংবাদপত্র জগতে, বুদ্ধিজীবী মহলে স্বস্তিকার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। চাহিদাও বাড়ছে। কিন্তু স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, সেই চাহিদা পূরণের পরিকাঠামো স্বস্তিকা এখনও গড়ে তুলতে পারেনি। তবুও বহু ছোট-বড় বাধাকে অতিক্রম করে পায়ে পায়ে স্বস্তিকা আজ চৌষট্টি বৎসর পেরিয়ে ৬৫-তে পা রাখল। ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও আপনাদের সকলের শুভেচ্ছায় স্বস্তিকা এগিয়ে চলুক— এই প্রার্থনা। ☐

কাল কেউটে মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ১৬ বছর বয়সে ভি জয়কুমারকে সাপে কেটেছিল। ভাগ্যিস সাপটার বিষদাঁত ছিল না, নাকি বিষদাঁত ভেঙে গিয়েছিল কে জানে! তবে যাক সে যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন জয়কুমার। কিন্তু সাপের সঙ্গে যে প্রেমপর্বটা সেদিন শুরু হয়েছিল আজ দু' দশক পার করেও তা অম্লান। হ্যাঁ প্রেমপর্বই বটে! অন্য কেউ হলে সেদিনের পর থেকে তার রজ্জুতে সর্পভ্রম অনিবার্যই থাকত বটে, কিন্তু অন্য ধাতুতে গড়া জয়কুমার আজ নির্দ্বিধায় বলছেন, ''বন্যপ্রাণীর, বিশেষ করে সাপের সংরক্ষণ দরকার কারণ প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় সাপ অপরিহার্য।'' ভেবে বসবেন না জয়কুমার জুলজি-তে এম এস সি, পি এইচ ডি করে প্রাণী বিশারদ কিংবা কলেজের অধ্যাপক-টধ্যাপক গোছের কিছু একটা হয়েছেন। আর্থিক অনটনে তাঁর লেখাপড়া বেশিদূর এগোয়নি। তাই ট্যাক্সি ড্রাইভারিই ভরসা। তবে সর্প-সংরক্ষণে তাঁর উদ্যোগ পশুপ্রেমী তো বটেই, কলেজে জুলজির অধ্যাপকদেরও লজ্জা দেবে। তাঁর বাস কর্ণাটক শহরের পশ্চিমঘাট পর্বতমালার কেন্দ্রবিন্দু শৃঙ্গেরী-তে। নিজের জীবনটাকেই তিনি উৎসর্গ করে দিয়েছেন সাপের জন্য, যে সে সাপ নয় সাক্ষাৎ যম কাল কাউটে, যার ইংরেজি নাম কিং কোবরা তার জন্য এবং এই বিপন্ন প্রজাতির সংরক্ষণের জন্য আধুনিক প্রজন্মের কাছে বার্তা পৌঁছে দিতে সদাই সচেষ্ট জয়কুমার।

জয়কুমারের বয়স এখন ৩৫। পেশায় ট্যাক্সি-ড্রাইভার হলে হবে কী, প্রকৃতিপ্রেমী হিসেবে তাঁর বেশ নামডাক হয়েছে আর নিজের শহরে তো তিনি 'কিং কোবরা ম্যান' হিসেবেই পরিচিত। মূলত তাঁর জন্যই অনেক কাল-কেউটেকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। নিদেনপক্ষে হাজারখানেক কিং-কোবরাকে তিনি উদ্ধার করেছেন এবং শ'খানেকের ওপর গ্রামবাসী ও ছাত্রছাত্রীদের এই বিপন্ন প্রজাতির সর্প সংরক্ষণের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন। তবে সাংঘাতিক বিষধর অতি বিপজ্জনক এই সাপ ধরার জন্য জয়কুমারের নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে, নিজে যার নাম দিয়েছেন, 'খালি হাত পদ্ধতি'! তিনি কর্ণাটক বন-আধিকারিকদের সঙ্গে কাজ করেছেন মালনাদ অঞ্চলে, জঙ্গল ছেড়ে পথে-ঘাটে বেরিয়ে পড়া সাপ ধরে আনতে এবং ধরার পর তাদের আবার জঙ্গলে ছেড়ে দিতে। সবচেয়ে আতঙ্কের ব্যাপার, জঙ্গল ছেড়ে হঠাৎ বেরিয়ে পড়া কেউটেগুলো মানুষের ঘর-দোরে ঢুকে পড়ছিল। এক্ষেত্রে যা হয়, আতঙ্কিত মানুষজনের হাতে হয় কেউটের মৃত্যু, নয়তো সর্পাঘাতে মানুষের মৃত্যু। এই চিত্রের বদল হয়েছে ভি জয়কুমারের সৌজন্যে, যেখানেই কেউটে সেখানেই তিনি। ফলে সাপগুলো যেমন প্রাণে বাঁচছে, মানুষও বাঁচছে তেমনি। জয়কুমারের কথায়,'' আমার উদ্দেশ্য এই বিপন্ন প্রজাতির সাপগুলোকে রক্ষা করা এবং শিশুদের এদের সম্বন্ধে অবহিত করা। আমি কেউটে ছাড়াও পাইথন, চন্দ্রবোড়া, গোখরো প্রভৃতি প্রজাতির সাপ গত পনেরো বছর যাবৎ ধরে আসছি। আমার একান্ত বাসনা এই সাপগুলো সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা। বন্যপ্রাণী এবং কালকেউটে সংরক্ষণে আমার এই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দিয়ে যেতে চাই পরবর্তী প্রজন্মকে।''

জয়কুমারের পাল্লায় পড়ে শৃঙ্গেরীর ব্যস্ত ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়াররাও প্রকৃতিপ্রেমী বনে গেছেন রাতারাতি। এঁদেরই একজন হলেন অনন্ত গণেশ। পেশায় অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার। আপাতত জয়কুমারের 'শিষ্যত্ব' গ্রহণ করেছেন। গুরু ট্যাক্সি ড্রাইভারের শিষ্য অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার—এটা একমাত্র বোধহয় ভারতেই সম্ভব। যেখানে গুরু হন তিনিই, যিনি তাঁর শিষ্যকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাত্রা করান। জয়কুমার একবার ১৮ ফুট লম্বা একটা সাপকে প্রায় একার প্রচেষ্টায় করতলবদ্ধ করেছিলেন আউগুম্বের নিকটবর্তী জঙ্গলে। পরে ভারতবর্ষের বৃহত্তম এই কেউটে-টিকে পশ্চিমঘাটে কুদ্রমুখ জাতীয় পার্কে ছেড়ে দিয়ে আসেন। ▯

সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত

বিকাশ ভট্টাচার্য

নীহারিকা কলকাতার দামী অঞ্চলের বিশাল বিলাসবহুল অট্টালিকার এক গৃহবধূ। শিক্ষিতা, নৃত্যাঙ্গনা, সুন্দরী রমণী। ঘরে তার অবিবেকী, রক্ষণশীল স্বামী। একমাত্র কন্যা স্পৃহা মূক ও বধির। সংসারের জেলে যেন আবদ্ধ, উন্নাসিক স্বামী কর্তৃক উপেক্ষিত, জীবনের একঘেয়েমিতে অভ্যস্ত নীহারিকা হঠাৎই যেন পায় মুক্তির হাতছানি। বাড়িতে আয়োজিত পার্টিতে মূক-বধির ছেলে-মেয়েদের নাচের অনুষ্ঠান দেখে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের আই. জি. ব্রিজ নারায়ণ দত্ত নীহারিকাকে সংশোধনাগারের আবাসিকদের নিয়ে এমন কিছু করার আহ্বান জানান, যাতে কালচারাল থেরাপির মাধ্যমে তাদের মানসিক পরিবর্তন হতে পারে। কারণ এখন কয়েদীদের অর্থাৎ সাজাপ্রাপ্ত দাগী অপরাধীদের অন্যচোখে দেখা হয়। জেল এখন সংশোধনাগার, কয়েদীরা এখন আবাসিক। উঁচু দেওয়ালের ভেতর তারা নানা ধরনের কাজ করে। দৈনিক ভাতা পায়। চার দেওয়ালের আড়ালে আবদ্ধ নীহারিকা যেন এমনই এক মুক্তির আশায় ছিল। জীবনের আর একটা দরজা যেন খুলে যায় তার সামনে। অফুরন্ত মুক্তধারায় সে ভেসে যায়। খুন করে, ডাকাতি করে, জালিয়াতি করে যারা আজ সাজাপ্রাপ্ত তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় নিজেকে। দস্যু রত্নাকর, অজস্র পাপ করেও শেষপর্যন্ত তপস্যার মাধ্যমে বাল্মীকিতে উত্তরণ, ইউসুফ, রসিদ, শঙ্করও যেন সেই মুক্তির সন্ধান পায়। নীহারিকা তাদের দিয়ে নৃত্যনাট্য 'বাল্মীকি প্রতিভা' করায়। এরা কেউ শিল্পী নয়, মার্জিত নয়— তবু এদের নিয়েই নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত কারামন্ত্রী, সরকারি আমলা, নিমন্ত্রিত অতিথিদের সামনে মঞ্চস্থ হলো সংশোধনাগারের আবাসিকদের 'বাল্মীকি প্রতিভা'। কিশোরী বনবালার ভূমিকায় তাঁর মূক-বধির মেয়ের অনায়াস অভিনয় দেখে নীহারিকার স্বামী অরিন্দমের চোখেও জল আসে।

'মুক্তধারা' সিনেমার এই প্রতিপাদ্য বিষয় বাস্তবের এক ঘটনার দ্বারাই উদ্বুদ্ধ। ২০০৭-এ ঠিক এমনই এক কর্মকাণ্ডে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নৃত্যাঙ্গনা অলকানন্দা রায়। তিনি আলিপুরের সংশোধনাগারের আবাসিকদের নিয়ে সত্যি-সত্যিই অভিনয় করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য 'বাল্মীকি প্রতিভা'। প্রথম অভিনয় হয় রবীন্দ্রসদনে। এবং পরবর্তী সময়ে আরও নানান জায়গায়। তাঁর প্রযোজনায় বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ভিকি নাইজেল আকারা। পনেরোয় প্রথম অপরাধ, ষোল বছর বয়সেই গ্যাংলিডার আর সতেরো থেকে পলাতক। অথচ জন্মেই তো কেউ অপরাধী হয় না। একসময় নাইজেল সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে অ্যাকাউনটেন্সিতে অনার্স করে হিউম্যান রাইটস-এ স্নাতকোত্তর পাঠ নিচ্ছিল। চোস্ত ইংরেজি বলায় অভ্যস্ত। অপরাধী, সাজাপ্রাপ্ত এই নাইজেল অলকানন্দা রায়ের সংস্পর্শে এসে বাস্তবে সত্যিই সত্যিই দস্যু রত্নাকর থেকে বাল্মীকি হয়েছেন। আজ তিনি মুক্ত, 'কলকাতা ফেসিলিটিস ম্যানেজমেন্ট' কোম্পানি চালাচ্ছেন, যেখানে এক্স-প্রিজনারদের তিনি কাজ দেন। সিকিউরিটি গার্ড, হাউস কিপিং স্টাফ হিসেবে কাজ করে পুনর্বাসন পায় তারা। এই যুক্ত, আমূল পরিবর্তিত, পাদপ্রদীপের আলোয় আসা ভিকি নাইজেল আকারা তাই অলকানন্দা রায়কে 'মা' বলে মনে করে। তিনিই নাইজেলকে দ্বিতীয় জীবন দিয়েছেন। এই নাইজলই আলোচ্য 'মুক্তধারা' ছবির নায়ক ইউসুফ মহম্মদ খাঁ— যিনি নীহারিকার 'বাল্মীকি প্রতিভা'র বাল্মীকি। গতবছর 'ইচ্ছে' ছবিটি করে রাতারাতি জনপ্রিয় পরিচালকদ্বয় শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায় বছর পাঁচেক আগে শান্তিনিকেতনে অলকানন্দা রায়ের প্রযোজনাটি দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'মুক্তধারা' ছবিটি করার পরিকল্পনা করেন। তবে কাহিনীর সূত্রটুকু ছাড়া সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য নিজেদের মতো করে নিয়েছেন তাঁরা। শেষে নাটকীয় মোচড়টাও তাঁদের নিজস্ব চিন্তার ফসল। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে তিন মাস প্রেসিডেন্সী জেলে গবেষণা করে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। শতকরা আশিভাগ স্যুটিং জেলের মধ্যেই রয়েছে। জেলের মধ্যে কয়েদীদের নিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটা ছায়াছবি বাংলায় মনে হয় প্রথম। তপন সিংহের 'লৌহকপাট'-এর কথা মাথা রেখেই বলছি। প্রগ্রেসিভ ফিল্মস প্রোডাকশান-এর নিবেদনে বাচ্চু বিশ্বাস প্রযোজিত এই ছবির প্রধান সম্পদ এর অভিনয়। নীহারিকার ভূমিকায় ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত— দহন, পারমিতার একদিন বা আলো ছবির পর এত মর্মস্পর্শী অভিনয় বোধ করি আর করেননি। সেইসঙ্গে তাঁর স্বামীর ভূমিকায় ব্রাত্য বসুর অভিনয়, বিশেষ করে মঞ্চে তাঁর মূক-বধির মেয়ের অভিনয় দেখে তাঁর মানসিক পরিবর্তন অপূর্ব। আই. জি. ব্রিজ নারায়ণ দত্ত-র ভূমিকায় দেবশঙ্কর হালদারের অভিনয় এক দরদী কর্তব্যনিষ্ঠ, সিদ্ধান্তে অনড় আই. জি.-কে তুলে ধরেছেন। মেয়ে স্পৃহার ভূমিকায় কিশোরী সুচিত্রা চক্রবর্তীর নির্বাক অভিনয় মনে দাগ কাটে। অবাক করেছেন পরিচালক শিবপ্রসাদ হ্যাপি সিং-এর অনবদ্য-সাবলীল অভিনয়ে। ইতিপূর্বে ছোটপর্দায় বহু অভিনয় তাঁর দেখেছি, বড় পর্দায় এটাই তাঁর অভিষেক। তিনি অনায়াসে অভিনয় ও পরিচালনা দুটোই চালিয়ে যেতে পারেন। নিজের ভূমিকায় নাইজেল অবাক করেছেন। ভবিষ্যতে বাংলা ছবিতে তাঁকে দেখলে অবাক হব না। ছবিতে 'বাল্মীকি প্রতিভা'র বেশ কিছু দৃশ্য দেখা যায়— যা উপরি পাওনা। মঞ্চের নৃত্যনাট্যের দৃশ্যপট ও আলোকসম্পাত --- সর্বোপরি পোশাক অনবদ্য। এর কৃতিত্ব কোরিওগ্রাফার অলকানন্দা রায়ের। নৃত্যনাট্যের গানগুলি এবং বহে নিরন্তর... রবীন্দ্রসঙ্গীত কাদের গাওয়া টাইটেল কার্ডে দেওয়া নেই। অপূর্ব সেই গান গাওয়া। প্রিমিয়ার শো-তে পরিচালক শিবপ্রসাদকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ইচ্ছে', 'মুক্তধারা'র পরে কি? জানা গেল তাঁদের পরের ছবির প্রাথমিক কাজ এগিয়ে চলেছে! সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'অলীক সুখ' অবলম্বনে গড়ে উঠছে পরবর্তী ছবি।

উর্দু দৈনিকে মোদীর বিস্ফোরক সাক্ষাৎকার

‘আমি দোষী হলে আমায় ফাঁসি দাও’

সমাজবাদী পার্টির প্রভাবশালী সদস্য শাহিদ সিদ্দিকি সম্পাদিত ও প্রকাশিত ‘নই দুনিয়া’ দিল্লীর একটি প্রতিষ্ঠিত উর্দু সাপ্তাহিক। সম্পাদক সিদ্দিকি সাহেব সম্প্রতি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি সচিত্র সাক্ষাৎকার তাঁর কাগজে প্রথম পাতায় প্রকাশ করেছেন। সাক্ষাৎকারটির শিরোনাম বেশ চাঞ্চল্যকর— ‘‘আমি দোষী হলে আমায় ফাঁসি দাও।’’ গোধরা পরবর্তী ঘটনায় বহুল প্রচারিত দাঙ্গার প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর এহেন নির্ভীক বক্তব্যটি সাক্ষাৎকারটিরই অংশবিশেষ। সম্পূর্ণ বয়ানটি তুলে দেওয়া হলো।

মুসলিমদের সংরক্ষণ

□ মণ্ডল কমিশনের সুপারিশের অংশ হিসেবে ওবিসি কোটার আওতায় মুসলিমরা কিছুটা সংরক্ষণ পেলেও আজও তাদের পূর্ণ অধিকার পায়নি, যদিও ইতিমধ্যে ২০টি বছর পার হয়ে গেছে।

ধরুন, ১০টি শূন্য পদের জন্য ৫০০টি দরখাস্ত জমা পড়েছে। তার মধ্যে ৫০ শতাংশ দরখাস্তকারী মুসলিম। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল হিন্দু পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের (ওবিসি) লোকই ১০টি পদ দখল করে নিল। এই বৈষম্য দূরীকরণের জন্যই সাচার কমিটি মুসলমানদের জন্য পৃথক সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছেন।

□ দেখুন, অনেক গভীর চিন্তা-ভাবনা, আলাপ-আলোচনার পরই ভারতবর্ষের সংবিধান প্রণেতারা দেশে ধর্মের ভিত্তিতে কোনও সংরক্ষণ না রাখার পক্ষেই মত দিয়েছিলেন। তাঁদের মত অনুযায়ী এটি বিপজ্জনক। মনে রাখবেন, সেই সময় কোনও আর এস এস বা বজরঙ্গ দল ছিল না।

□ হ্যাঁ, মুসলিম নেতাদের মধ্যে সর্ববরিষ্ঠ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ স্বয়ং ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু বিগত ৬৪ বছরের অভিজ্ঞতা থেকেও আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। ইতিমধ্যে সংবিধানে অজস্র সংশোধনী হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে, দেরিতে হলেও ৬৪ বছর পরে যদি আমরা মুসলমানদের ক্রমশ পিছিয়ে পড়া আটকাতে, তাদের জন্য আলাদা সংরক্ষণের পক্ষে মত দিই, তাতে কি আপনার কোনও আপত্তি আছে?

□ অবশ্যই। আমাদের সংবিধানের মৌলিক কাঠামোয় কখনও কোনও পরিবর্তন করা যাবে না। তবে, আমি অন্য একটা বিষয়ে বলতে চাই। তোমার (তুমিই বলছি) কথাতেই, তুমি যেসব ধর্মনিরপেক্ষ ও উন্নত রাজ্যগুলির কথা বলছ, হিসেব করে দেখ সেখানে সরকারি চাকরিতে মুসলিমদের অংশগ্রহণ শতকরা ২ থেকে ৪ ভাগ। কিন্তু গুজরাটে মুসলিমরা জনসংখ্যার ৯ শতাংশ হলেও চাকরীক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ ১২/১৩ শতাংশ। উদাহরণ দিলে দেখবে পশ্চিমবাংলায় মুসলিম জনসংখ্যা শতকরা ২৫ ভাগ অথচ চাকরীতে আছে মাত্র ২ শতাংশ।

□ হ্যাঁ, গুজরাটের মুসলমানরা অনেক এগিয়ে আছে। তবে তাতে তোমার কোনও অবদান নেই। তারা শিক্ষা ও ব্যবসাক্ষেত্র উভয়তেই এগিয়ে।

□ ঠিক, তুমি যা বললে তাই মেনে নেওয়া যাক। এই সঙ্গে মনে রাখ, গত প্রায় কুড়ি বছর গুজরাটে বিজেপি সরকার চলছে। যদি আমরা তাদের শেষ করে দেওয়ার পরিকল্পনাই নিতাম তাহলে কি তারা শিক্ষা ও ব্যবসাক্ষেত্রে একইভাবে এগিয়ে যেতে পারত? সাচার কমিটির হিসেব জরিপ যখন শুরু হয় তখন আমিই গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম। সরকারি

চাকরিতে যে ৬ লক্ষ নিয়োগ হয়েছে তার মধ্যে আমার আমলেই ৩ লক্ষ চাকরির সংস্থান।

▯ আচ্ছা, তোমার আমলের এই নিয়োগের সংখ্যার মধ্যে কি ১০/১২ শতাংশ মুসলিমরা চাকরি পেয়েছিল?

▯ না, আমি ওইভাবে গুণিনি। হিন্দু না মুসলিম এই ভিত্তিতে মাথা গুণতি করা আমার চিন্তার বিরোধী। তবে, তুমি যদি সাচার কমিটির রিপোর্ট বিশ্বাস কর তাহলে গুজরাটের বিষয়ে দেওয়া তাদের রিপোর্ট অবিশ্বাস করছ কেন?

দাঙ্গার সময় কি হয়েছিল

▯ আচ্ছা, আমরা যদি গুজরাট দাঙ্গা নিয়ে কথা বলি সেক্ষেত্রে তুমিই বল সেই সময় ঠিক কি হয়েছিল? তুমি কি বলতে পার সেই কুখ্যাত ট্রেনে যারা গোধরায় পুড়ে মরেছিল তাদের লাশ আমেদাবাদ অবধি কেন টেনে আনা হলো? এর ফলশ্রুতি কি হতে পারে তা কি তুমি বুঝতে পারনি?

▯ দেখ, তোমার প্রশ্নটি নতুন নয়। এর বিশদ উত্তর আমি SIT (Special Investigation Team)-এর কর্তাদেরও সুপ্রিম কোর্টে দিয়েছি। তবু বলছি, দেহটা কার ছিল সেটা যতটা না গুরুত্বপূর্ণ তার থেকে ঢের বেশি গুরুত্বের ছিল মৃতের পরিবারের হাতে দেহ ফেরত দেওয়াটা। সেই উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে সকলের গোধরাতে ছুটে যাওয়াটা মোটেই অভিপ্রেত ছিল না। গোধরার এই আপৎকালীন বাতাবরণের জন্যই পুড়ে যাওয়া দেহগুলিকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসাটা জরুরি ছিল।

▯ বেশ, তবে তুমি শোরগোল ছাড়াই দেহগুলিকে কোনও হাসপাতালে এনে তারপর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারতে। তার জায়গায় শবদেহ নিয়ে মিছিল করার কি দরকার ছিল?

▯ গোধরা জায়গাটা তখন খুব বড় কিছু ছিল না। অতগুলো শবদেহকে যত্ন সহকারে রাখার মতো ব্যবস্থা তো ছিলই না। সেই কারণেই দেহগুলিকে স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন ছিল। এটি একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত। গলিত, দগ্ধ, অর্ধদগ্ধ মৃতদেহগুলির দর্শনে স্থানীয় মানুষের উন্মাদনায় যাতে ইন্ধন না পড়ে তাই রাতের অন্ধকারের সহায়তা নেওয়া হয়েছিল, আর কিছু নয়। হয়তো বলতে পার দেহগুলিকে আমেদাবাদের সিভিল হাসপাতালে কেন আনা হলো না। মনে রাখতে হবে, আমেদাবাদ সিভিল হাসপাতাল সবসময়ই রোগী, মানুষে গমগম করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেহগুলিকে 'শোলা সিভিল হাসপাতালে' পাঠানোর প্রশাসনিক ভাবনা নিঃসন্দেহে একটি সঠিক ও সময়োচিত সিদ্ধান্ত। সেই সময়কার শোলা আজকের মত ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল ছিল না আর আমেদাবাদ থেকে বেশ খানিকটা দূরে হওয়ায় অশান্তির ভয়ও কম ছিল। হ্যাঁ, শোলা থেকে কোনও শব-মিছিল বেরোয়নি। এক এক করে নীরবে দেহগুলি পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

দাঙ্গা কেন থামল না?

▯ দাঙ্গা তো গুজরাটে শুরু হলো। বেমক্কা লোকজন মরতে লাগল। ঘর বাড়িতে আগুন দেওয়া হলো। আর তুমিই ছিলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তাই নিশ্চয় জানতে আমেদাবাদে কি ঘটে চলেছে। এসব বন্ধ করার জন্য কি কি জরুরি ব্যবস্থা নিয়েছিলে?

▯ প্রথমত, আমরা নাগরিকদের কাছে আন্তরিক আবেদন জানাই শান্ত থাকার জন্য। শান্তি, সুরক্ষা যাতে বিঘ্নিত না হয় তার জন্য অনুরোধ করি। মনে রেখো এই আবেদন আমি 'গোধরা' থেকেই প্রথম করেছিলাম। এর পরপরই আমি আমেদাবাদ রেডিও এবং টিভি থেকে একই আবেদন জানাই। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রশাসনকে এই দাঙ্গা প্রশমনে গোটা পুলিশ বাহিনীকে নিয়োজিত করার তাৎক্ষণিক আদেশ দিই। গোধরা পরবর্তী পর্যায়ের মাপের দাঙ্গা ভারতবর্ষে অতীতে কখনও ঘটেনি। আর এটিই সারা 'দিন-রাত' চালু থাকা টিভি সম্প্রচারের আলোয় ধরা প্রথম সব থেকে বড় দাঙ্গা। অতীতে সরকার তার প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও পদ্ধতিগুলিকে গুছিয়ে নেওয়ার কিছুটা সময় পেত। কেননা খবর বেরোত পরের দিন সকালবেলার কাগজে। গোধরার সময় প্রশাসনকে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছিল টিভি চ্যানেলগুলির সঙ্গে। তারা কোনও ঘটনা ঘটার কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার খবর ছড়িয়ে দিচ্ছিল। ব্যাপারটা দেখ, আমেদাবাদ থেকে আমি ইচ্ছে করলেই বরোদায় থাকা কারুর সঙ্গে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ফোনে কথা বলে নিতে পারি। কিন্তু পর্যাপ্ত পুলিশবাহিনীর সেখানে পৌঁছতে তো কম করে ২ ঘণ্টা লাগবে। হায় রে! পুলিশ কি টিভি খবরের সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিতে পারে?

আর এর সঙ্গে কোনওভাবেই আমি অতীতের অন্য কোনও দাঙ্গার তুলনা টানতে রাজি নই। আমার কথা হলো দাঙ্গা দাঙ্গাই। ১৯৮৪ সালের ইন্দিরা হত্যার পরবর্তী দাঙ্গায় পুলিশের এক ঘা লাঠিও পড়েনি আর একটি গুলিও তারা খরচ করেনি। হ্যাঁ, একটি জায়গায় অবশ্য লাঠি-চার্জ হয়েছিল যেখানে প্রয়াত ইন্দিরার দেহ শায়িত ছিল। সেই স্থানটিতে ব্যাপক জনতার জমায়েত হওয়ায় তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ লাঠি চালিয়েছিল। না, দাঙ্গা দমনে তারা কখনওই গুলি গোলার পথে হাঁটেনি। খেয়াল করবে, গুজরাটে ফেব্রুয়ারির ২৭ তারিখেই কারফিউ জারী করা হয়। আনুষঙ্গিক সমস্ত নিরোধক ব্যবস্থাই নেওয়া হয়। পুলিশ জনতার ওপর লাঠি চালানোর পরবর্তী ধাপ হিসেবে অবস্থা অনুযায়ী গুলি চালাতেও দ্বিধা করেনি।

হিন্দুদের কি তড়িঘড়ি কোনও এসপার-ওসপার করার নীরব প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছিল?

▯ তোমার দলীয় সহকর্মী শুধু নয়, অনেক সরকারি আধিকারিকের মুখেও শোনা গেছে, তুমি নাকি সংখ্যাগুরুদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যা কিছু ঝাল মিটিয়ে নেওয়ার ক্লিন চিট দিয়েছিলে। আর কেউ নয়, সেই সময়কার তোমারই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রয়াত হরেন পান্ডিয়া ও আই পি এস অফিসার সঞ্জয় ভাট যিনি আবার আদালতে হলফনামা দিয়ে তোমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগকে জোরদার করতে চেয়েছিলেন, সে সম্পর্কে তুমি কিছু বলতে চাও?

▯ অবশ্যই, দেখ তোমাকে কাউকে না কাউকে তো বিশ্বাস করতে হবেই। তুমি আমায় যদি অবিশ্বাস কর তাহলে সুপ্রিম কোর্টকে তো বিশ্বাস করবে। তোমার হয়তো মনে আছে, সমগ্র ঘটনা খতিয়ে দেখতে সর্বোচ্চ আদালত তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দেয়। তো, তার ওপর তো আমাদের আস্থা রাখতে হবে। গোধরার ঘটনা ঘটেছিল ২৭ ফেব্রুয়ারি। দাঙ্গা শুরু হয় ঠিক পরের দিন। আর আমি সেনাবাহিনীকে নিযুক্ত করি ১ মার্চ। সংবাদমাধ্যম বারবার বলে আসছে আমি ৩ দিন পরে সেনাবাহিনীকে

ডেকেছি। তারা সুবিধেজনকভাবে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করে ফেব্রুয়ারি মাসটা ২৮ দিনে শেষ হয়।

দাঙ্গা কি পূর্ব-পরিকল্পিত ছিল?

■ দেখ, দেখলেই কেমন যেন সন্দেহ হয় দাঙ্গাটা বেশ ভেবেচিন্তেই করা হয়েছিল। বেছে বেছে মুসলমানদের দোকানপাট, ঘর-বাড়িগুলোতেই আগুন দেওয়া হয় যার ফলে সন্দেহ হয় সব কিছুই যেন পূর্ব-পরিকল্পিত।

■ এটি একটি নির্জলা মিথ্যে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচার। অন্যদিক দিয়ে একবার ভাব কত সংখ্যক মুসলিমকে সেদিন নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছিল। তোমার কথামতো তাদের যদি পরিকল্পিত ভাবে মেরে ফেলার চেষ্টাই করা হোত সেক্ষেত্রে কতজন বেঁচে থাকতেন?

■ মুসলমানরা মানসিকভাবে ভীষণ আহত। তাদের মন সন্দেহদীর্ণ। তারা কিন্তু সত্যটা জানতে চায়। বলো তো, তোমার মন্ত্রীরা কি সেদিন সত্যিই পুলিশ কন্ট্রোল রুমে উপস্থিত ছিল?

■ আগের প্রশ্নের মতো এটিও সর্বৈব মিথ্যে। সব বাস্তব তথ্যই এস আই টি-এর কাছে জমা দেওয়া আছে। আগেই বলেছি, মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট যথাযথ তদন্তের ব্যবস্থা করেছিল। একটু অপেক্ষা করে দেখই না তারা কি কি আবিষ্কার করে।

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর মন্তব্য

■ বলতে পার অটলবিহারী বাজপেয়ী সেই অগ্নিগর্ভ সময়ে তোমায় ঠিক কি বলেছিলেন। তিনি কি বলেননি তুমি তোমার রাজধর্ম পালনে ব্যর্থ হচ্ছ?

■ এটিও অসত্য। তাঁর বক্তৃতায় অটলজী বলেছিলেন, সর্বদাই রাজ-ধর্ম পালন করতে হবে। সঙ্গে তিনি যোগ করেছিলেন গুজরাতের ক্ষেত্রেও তার কোনও ব্যত্যয় হয়নি। কিন্তু মিডিয়া বাজপেয়ীজীর উক্তির অর্ধাংশই শুধু প্রচার করেছিল। সবটা নয়।

আমি অপরাধী হলে আমাকে ফাঁসিতে লটকে দাও

■ হয়তো মনে আছে, ১৯৮৪'র শিখ দাঙ্গার পর রাজীব গান্ধী ক্ষমা চেয়েছিলেন। পরে সোনিয়া গান্ধী, মনমোহন সিংরাও ক্ষমা চেয়েছেন। সেইভাবে ২০০২-এর দাঙ্গার জন্য দুঃখপ্রকাশ করে তুমি আজ পর্যন্ত ক্ষমা চাওনি কেন? সরকারের শীর্ষ ব্যক্তি হিসেবে এটা তো তোমার নৈতিক দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে।

■ প্রথমত, তুমি সেই বিস্ফোরক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দেওয়া আমার তৎকালীন বক্তব্যগুলির দিকে একটু নজর দিলেই ভাল করবে। ২০০৪ সালে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে আমি একই কথা বলেছিলাম। আমার সরকার যদি এই দাঙ্গায় জড়িত থেকে থাকে, তাহলে আমাদের সকলকেই রাস্তার মাঝখানে ঝুলিয়ে দেওয়া হোক। আর প্রশাসনিক কর্তা-ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ফাঁসি বা এমন কঠিন শাস্তি দেওয়া হোক ভবিষ্যতের কোনও প্রশাসক যেন এই ধরনের পাপ কাজ করতে ভয় পায়। তাই যারা তাদের ক্ষমা-টমা করে দেওয়ার কথা বলছে তারা এক হিসেবে অপরাধীকেই প্রশ্রয় দিচ্ছে। নয় কি? মোদী যদি পাপ করে থাকে তাহলে মোদীকে ফাঁসিতে চড়াতেই হবে। কিন্তু বহু প্রাণ বাঁচাবার আমার আন্তরিক চেষ্টাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে যদি রাজনৈতিক কারণে কিছু লোক আমাকে কেবল গালি দিয়েই যায় সেক্ষেত্রে আমার বলার কিছু থাকে না।

■ সমগ্র ঘটনার পর তোমার নিজের কি কোনও দুঃখবোধ হয়? তোমার অন্তরে কি শত শত নিহত মানুষদের জন্য শোক তোমাকে ক্ষমা চাইতে আদেশ দেয় না? আমি এই কাগজটার সম্পাদক আর আমার কোনও সহকর্মীর দেওয়া ভুল তথ্য যদি আমি ছাপিয়ে ফেলি আমি পরক্ষণেই ক্ষমা চেয়েছি।

■ তোমার আজকের এই ক্ষমা চাইতে বলার প্রসঙ্গ নিরর্থক। সেই সময়কার দুঃখজনক ঘটনার জন্য আমি পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে শোক প্রকাশ করে ক্ষমাও প্রার্থনা করেছিলাম। দয়া করে ২০০২ সালে দাঙ্গার পর আমার বক্তব্যগুলো তোমার বা অন্য মিডিয়ার সঙ্গে একটু চেক করে নাও। তারপরে লেখ। গত ১০ বছর ধরে এক নাগাড়ে তোমরা (মিডিয়া) আমার ওপর কি বিপুল অন্যায় করে চলেছ। এবার কিন্তু মোদীর কাছে ক্ষমা চাইবার সময় তোমাদের এসেছে।

■ তুমি ভারতীয় মুসলমানদের উদ্দেশ্যে আলাদা করে কিছু বলতে চাও কি?

■ দেখ ভাই, আমি একজন ক্ষুদ্র মানুষ। আমার কাউকে কোনও বাণী পাঠাবার মতো অধিকার কখনই নেই। আমি জনতার এক ভৃত্য এবং তাই থেকে যেতে চাই। আমার মুসলিমভাইদের শুধু এটুকুই অনুরোধ তাঁরা নিজেদেরকে শুধুমাত্র অন্যের ভোটারের পরিচয়ে নামিয়ে আনবেন না। দুঃখের বিষয় আজকের ভারতীয় রাজনীতিতে তারা কেবল নগন্য একজন ভোটারের পরিচয়েই নিজেদের আবদ্ধ করে ফেলেছেন। আমি মনে করি মুসলিমভাইরা স্বপ্ন দেখুন। তাদের স্বপ্ন, তাদের সন্তান, সন্ততিদের স্বপ্ন সফল করতেই হবে। হ্যাঁ, তাঁরা ভোটার তো বটেই তবে তাঁরা তাঁদের ভোটাধিকার খোলা মনে প্রয়োগ করুন। তবে তার আগে তাদেরকে আমাদের মানুষ হিসেবে ও ভারতীয় হিসেবে ভাবতে হবে। তাদের সমস্যাগুলিকে বোঝবার আন্তরিক চেষ্টা দরকার।

এক্ষেত্রে আমি যদি তাদের কোনও সাহায্যে আসতে পারি আমি সানন্দে তা করতে রাজি। তবে তাদেরও সাদা চোখে, খোলা মনে একটু ভাবতেই হবে।

(সূত্র : দি টেলিগ্রাফ)

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার ক(ে
মাত্র দুই মিনিটে ৈির তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন,
বোলপুর ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

শব্দরূপ-৬৩৭ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

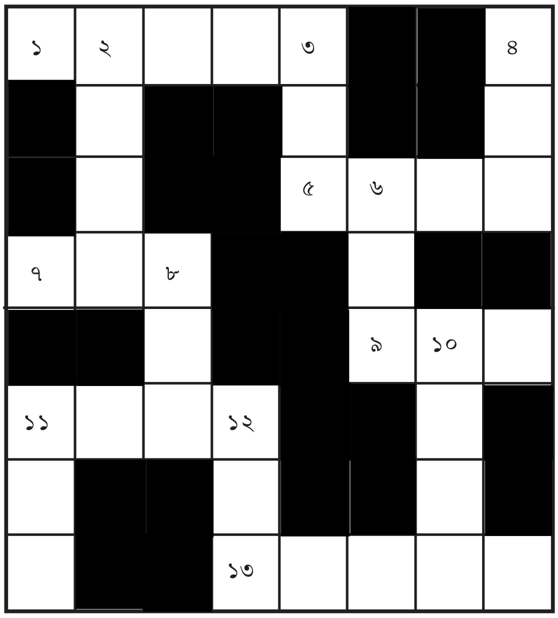

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. অশৌচান্ত স্নানের পর নববস্ত্র পরিধান, ৫. ভিড় ও জমকের লক্ষণ প্রকাশ; গমগম, ৭. একটি ছোট্ট পাখি, ৯. দৌড়নো বা হাঁটাহাঁটির শ্রম, ১১. দ্বীপান্তর দণ্ড, ১৩. ন্যায়ের কূটতার্কিক।

উপর-নীচ : ২. টাঁকশালের অধ্যক্ষ, ৩. রোগশূন্য, ৪. কৃষ্ণসহচর গোপবালক, ৬. সমুদ্রমন্থনের সময় মন্থনদণ্ড হিসাবে এই পর্বত ব্যবহৃত হয়েছিল, ৮. বাঁশ ইত্যাদির খুঁটি যা পায়ে লাগালে দ্রুত হাঁটা যায়, ১০. সুবিন্যস্ত, ১১. যমুনা নদী, ১২. গ্রীষ্মকাল।

সমাধান
শব্দরূপ-৬৩৪
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

			পু		পা	ব	ক
	খ	পু	ষ্প		র্ব		ল্যা
অ			রে	ব	তী		ণ
হ	র	ধ	নু				জ
ল্যা				শ্রু	ত	সে	ন
দ্রৌ		প	রা	ত			ক
প		রে		কী	চ	ক	
দী	নে	শ		র্তি			

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

▯ ৬৩৭ সংখ্যার সমাধান আগামী ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১২ সংখ্যায়

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

।। চিত্রকথা।। মহাভারত।। ৮

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

প্রাসঙ্গিকী

রানে খোঁজ মিলল 'অনাবিষ্কৃত' দুর্গের

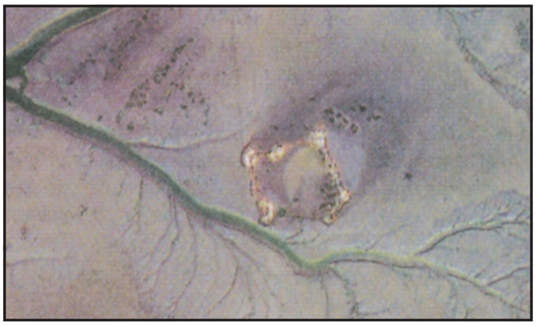

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ভারত-পাক সীমান্তের কাছে খোঁজ মিলল পঞ্চভুজাকৃতি দুর্গের ধ্বংসাবশেষের। অনুমান উনিশ শতকের শক্তিশালী ভূমিকম্পে চাপা পড়ে যায় দুর্গটি। প্রাক্তন ইসরো (ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন) বিজ্ঞানী পি এস থাক্কের এবং তিন গবেষক এই ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেয়েছেন। কচ্ছের রান অঞ্চলে ১৮১৯ সালে ভূমিকম্পের তীব্রতা অনুমান করতে এই ধ্বংসাবশেষ সাহায্য করবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

২০১০-এর ফেব্রুয়ারিতে শ্রী থাক্কের আমেদাবাদস্থিত ইসরোর স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার থেকে অবসর নেওয়ার পর নিজের স্বভাব মতোই গুগুল আর্থ ইমেজে ঘাঁটতে গিয়ে 'আবিষ্কার' করেন আন্তর্জাতিক সীমানার কয়েক কিলোমিটারের মধ্যেই একটি দুর্গের হদিশ। থাক্কের জানিয়েছেন, 'আমি অনেক লোককেই বিষয়টি বলেছিলাম। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করেনি। তবুও আমি হাল ছাড়িনি।' থাক্কের যোগাযোগ করেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে। এবং তাদের পরামর্শে বি এস এফের কাছে অনুমতি চান ওই এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য। যথারীতি অনুমতি মেলে।

বলা বাহুল্য এর ঐতিহাসিক প্রমাণাদিও যথেষ্ট পরিমাণে যোগাড় করে ফেলেছেন তিনি। ১৮১৯-এর সেই ভয়াবহ ভূমিকম্পের পরে ১৮৩৭ সালে জনৈক ইংরেজ টি জি কার্লেস তাঁর, 'মেমোইয়ার টু অ্যাকম্পানি দ্য সার্ভে অব দি ডেল্টা অব দি ইন্ডাস' গ্রন্থে বাস্তা বান্ডার নামে চিহ্নিত এই দুর্গটির উল্লেখ করেছেন। কার্লেসের বইতে রয়েছে, ''ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গটি... যেটি কচ্ছের রাওস (রাণী)-দের অধীনে ছিল, সেটি সিন্ধিদের সঙ্গে কচ্ছের রাণীদের যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।'' গত বছরের ৪ ফেব্রুয়ারি বি এস এফের 'ক্রোকোডাইল কম্যান্ডো'দের সহযোগিতায় শ্রী থাক্কের এবং তাঁর তিন সহযোগী— ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরির এন জুয়েল ও কচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম জি থাক্কার এবং মমতা এনগাঁওগম পরিদর্শন করেন বাস্তা বান্দারের অকুস্থল। পুরো বিষয়টি থাক্কের ২৫ জুলাইয়ের 'কারেন্ট সায়েন্স' সংখ্যায় বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

এম জি থাক্কার বর্তমানে কচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিষয়ের ডিন ও ডিপার্টমেন্ট অব আর্থ অ্যান্ড এনভায়রণমেন্টাল সায়েন্সের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি জানাচ্ছেন,''আমরা বাস্তা বান্দারের অকুস্থলে ঘণ্টা দুই-তিন কাটাই। জায়গাটা পরীক্ষা করি, ছবিও তুলি। কিছু নমুনাও সংগ্রহ করি।'' সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা করে তিনি দাবি করছেন দুর্গের বয়স ২১৪ বছর। থাক্কের বাহিনীর এই আবিষ্কার স্বীকৃতি পেলে ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্র যেমন প্রসারিত হবে তেমনি গুজরাটের রান অঞ্চলের অনেক অজানা ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার হবে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

বিজেপির আইনজীবী শাখার রাজ্য সম্মেলন

গত ২৮ জুলাই মহাজাতি সদনের অ্যানেক্স হলে বিজেপির লিগ্যাল অ্যাণ্ড লেজিসলেটিভ সেলের তৃতীয় রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় ছিল— সকলের জন্য বিচার: কারুকে তোষণ নয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলের আইনজীবী সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। অতিথিদের মধ্যে ছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা ও দলের রাজ্যসভার সদস্য চন্দন মিত্র। বিজেপির এই সংগঠনে সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন আইনজীবী সমীর পাল। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সঞ্জয় ঘোষ। — ছবি : কৃষানু মিত্র

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
13 August - 2012

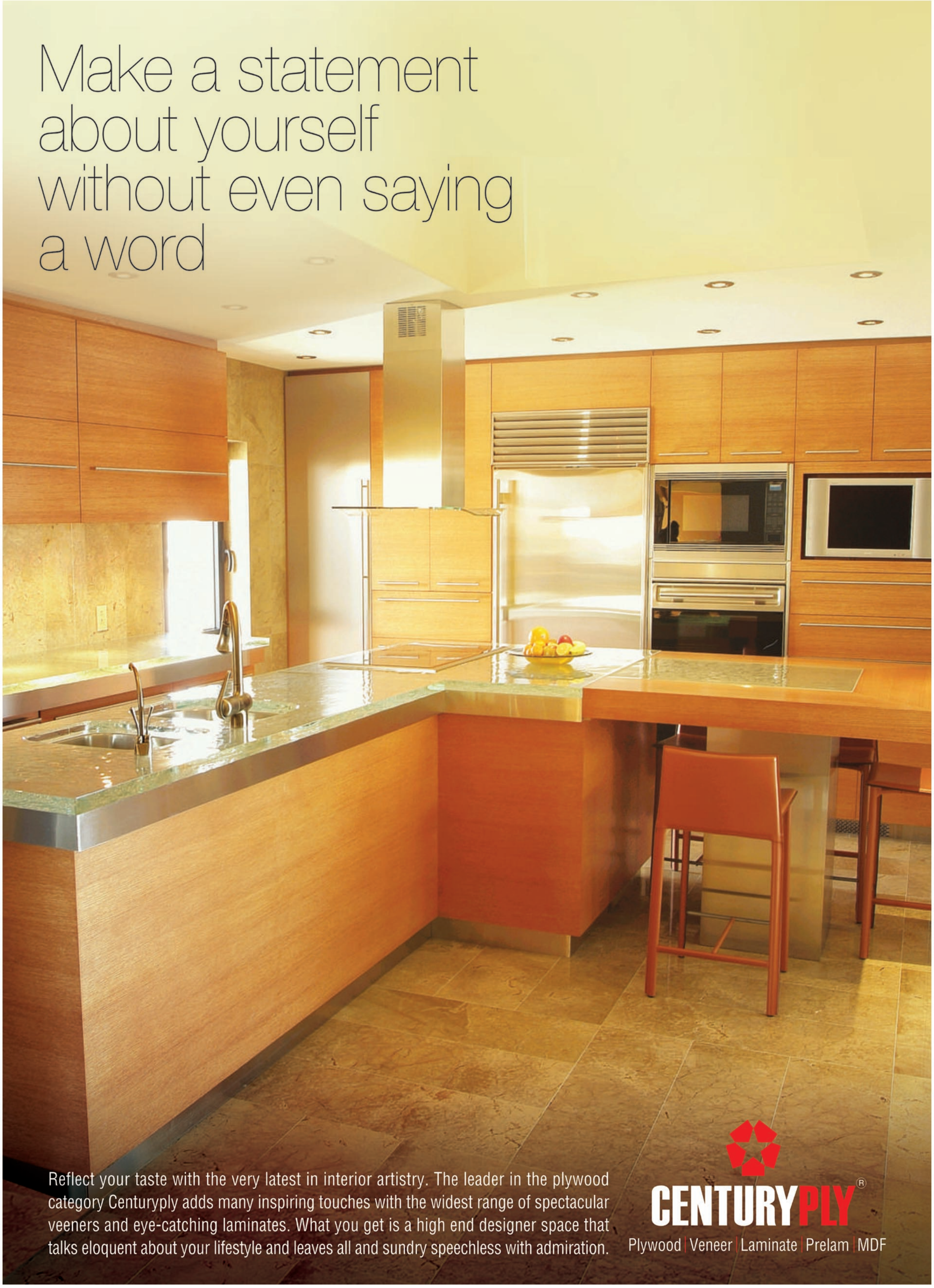

দাম : ৭.০০ টাকা